মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা ধর্মনিরপেক্ষতা

হারুনুর রশীদ
মুজাহিদুল ইসলাম

সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

মৌলবাদ
সাম্প্রদায়িকতা
ধর্মনিরপেক্ষতা

হারুনুর রশীদ

মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম

সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা ধর্মনিরপেক্ষতা

হারুনুর রশীদ

মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম

প্রকাশক

মুহাম্মদ আশরাফুল হক

প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স সেক্রেটারি

সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

৪৪৭ গ্রীনওয়ে, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ১৮ জুন ১৯৯৭

দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৮

মুদ্রণে

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য ঃ ২০.০০ (বিশ) টাকা মাত্র

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ধর্মনিরপেক্ষতা মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা ও ইসলাম

হারুনুর রশীদ

চিন্তাবিদ কলামিস্ট

এক.

ইংরেজী Secular এবং Secularism শব্দদ্বয়ের বাংলা করা হয়েছে যথাক্রমে ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। Random House Dictionary of the English Language (College Edition, N. Y. 1968)-এ Secular শব্দের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে হুবহু এভাবে ঃ

1. Of or pertaining to worldly things, not regarded as religious, spiritual sacred or temporal.
2. Not pertaining to or connected with religion (opposed to sacred).
3. Concerned with non-religious subjects.
4. Not belonging to a religious order.

আর Secularism শব্দের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে হুবহু এভাবে ঃ

1. Secular spirit or tendency, especially a system of political or social philosophy that rejects all forms of religious faith.
2. The view that public education and other matters of civil policy should be conducted without the introduction of a religious element.

Encyclopaedia Britannica ও Oxford Dictionary-র সংজ্ঞাও অনুরূপ।

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, secular বা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি কোন ধর্মেরই অন্তর্গত নন। (Not belonging to any religious order), যিনি কোন ধর্মের সংগে সম্পৃক্ত নন। (Not pertaining to or connected with religion) এবং যিনি ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা (Sacred)-র বিরোধী। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে সেই রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন, যা সকল ধর্মবিশ্বাসকেই প্রত্যাখ্যান করে (rejects all forms of religious faith).

দলনিরপেক্ষ ব্যক্তি যেমন কোন দলের অন্তর্ভুক্ত নন, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিও তেমনি কোন ধর্মে অন্তর্ভুক্ত নন।

দুই.

ইংরেজী Fundamentalism শব্দের বাংলা করা হয়েছে মৌলবাদ।

Encyclopaedia Britannica (Ed. 1970, NY, P. 1009-11)-এ মৌলবাদ বা Fundamentalism-এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

> The content of its (Fundamentalism's) teaching was identical with that of classical Protestant Orthodoxy. Its purpose was nothing more than to preserve unchanged the presuppositions and convictions of reformation protestantanism and also of Roman Catholicism in regard to the nature of Christianity as a redemption religion, the place of the supernatural and the miraculous in Christianity and the nature of the Bible as belief in every part an authoritative revelation of the mind and purposes of God.

এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোস্যাল সাইন্স অনুযায়ী "মৌলবাদ" প্রোট্যাস্টান্ট খ্রীস্টানদের একটি গোঁড়া ধর্মীয় মতবাদ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ফলে যে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনার উদ্ভব ঘটে, তার বিপরীতে বাইবেলের প্রাচীন ব্যাখ্যা ও মৌলিক অনুশাসনকে আঁকড়ে ধরে রাখাই হলো মৌলবাদীদের লক্ষ্য।

১৮৭৬ সালে ম্যাসাচ্যুসেটস্-এর সোয়াম্পস্কট্ নামক শহরে অনুষ্ঠিত বাইবেল কনফারেন্স এবং ১৯৭৭ সালে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত প্রফেটিক কনফারেন্সের মাধ্যমে ফান্ডামেন্টালিস্ট আন্দোলনের সূচনা। পাদ্রী জেমস ইঙ্গলিস (James Inglis) কানাডার নায়াগ্রা অন দি লেক শহরে শুরু করেন নায়াগ্রা বাইবেল কনফারেন্স। এই আন্দোলন

মিলেনারিয়ান আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯১০-১২ সাল পর্যন্ত সময়ে মিলেনারিয়ান আন্দোলনের উদ্যোক্তারা ১২ খণ্ডে Fundamentals : A Testimony of Truth গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ভাষায় ঃ "The Bible Conference with its strong "prophetic" coloration was vigorously evangelistic and revivalistic."

এই আন্দোলনের উদ্যোক্তারা মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজমের পাঁচটি ভিত্তি নির্ধারণ করেন ঃ

১. The plenary inspiration and inerrancy of scripture (বাইবেলের নিঃশর্ত অনুপ্রেরণা ও অভ্রান্ততা);

২. The deity of Jesus (যীশু খ্রীষ্টের দেবত্ব);

৩. The virgin birth of Jesus (কোন পুরুষের ঔরস ব্যতীত কুমারী মেরীর গর্ভে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম);

৪. Substutionary blood atonement (মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু যীশু খ্রীষ্টের রক্তক্ষরণ ও মৃত্যু);

৫. The bodily resurrection and premillenial second coming of Christ (যীশু খ্রীষ্টের সশরীরে পুনরুত্থান ও রাজত্ব)।

১৯১৯ সালে মিলেনারিয়ান আন্দোলনের নাম পরিবর্তন করে World Christian Fundamentals Association নামকরণ করা হয়। মৌলবাদী বা ফান্ডামেন্টালিস্টরা আধুনিকতা, প্রগতি ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির ঘোরতর বিরোধী। যেসব ধর্মযাজক বা ধর্মবিদ বিজ্ঞান প্রযুক্তির সত্যকে মেনে নিতে এবং কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাইবেলের প্রতিপাদ্যের সংগে সাংঘর্ষিক হলে, তার কারণ নির্ণয় করতে আগ্রহী, মৌলবাদীরা তাদের ধর্মদ্রোহী (Heretic) বলে বিবেচনা করে।

বর্তমানে মৌলবাদীদের ৪টি প্রধান ঘরণা ঃ Baptists, Presbyterians. Methodists এবং Evangelists. বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যের হোয়েটন শহরে মৌলবাদীদের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

মৌলবাদের ইতিহাস, মৌলবাদের সংজ্ঞা, মৌলবাদের শর্তাবলী ইত্যাদি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, মৌলবাদ সম্পূর্ণরূপেই প্রোট্যাস্ট্যান্ট খ্রীষ্টানদেরই একটি ব্যাপার, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন যীশু খ্রীষ্ট। এটাও সুস্পষ্ট যে মৌলবাদের সংগে অন্য ধর্মের মূলতঃ কোনই সম্পর্ক নেই, ইসলামের সংগে সম্পর্কের তো প্রশ্নই ওঠেনা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাসহ অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থে মৌলবাদের যে সংজ্ঞা ও বর্ণনা দেয়া আছে, তার কোথাও ইসলাম সম্পর্কে একটি শব্দও উল্লেখ হয়নি এবং কোথাও মুসলমানদের বা মুসলমানদের কোন অংশকে মৌলবাদীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বস্তুতঃ মৌলবাদ যেহেতু যীশু খ্রীষ্ট ও বাইবেলভিত্তিক একটি ব্যাপার, সেহেতু মৌলবাদের সংগে ইসলাম বা মুসলমানদের সম্পর্কিত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

তিন.

প্রসংগতঃ সাম্প্রদায়িকতা বা Communalism শব্দটিও বিবেচনা করা দরকার। Communalism হলো ঃ Strong allegiance to one's own ethnic group, rather than to society as a whole. অর্থাৎ, সমাজের বদলে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উগ্র আনুগত্যই হলো সাম্প্রদায়িকতা। অন্য কথায়, যারা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণু ও বিদ্বেষপরায়ণ তাদেরকেই বলা হয় সাম্প্রদায়িক। ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা যেমন হতে পারে, তেমনি নৃতত্ত্ব বা বর্ণভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাও হতে পারে। যেমন ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাপার্টহীড (Apartheid), হিন্দু ধর্মের বর্ণভেদ, নাৎসীবাদ ইত্যাদিও সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্গত।

চার.

যদিও "মৌলবাদ" শব্দটি উৎপত্তি, সংজ্ঞা ও তাৎপর্যগতভাবে একটি গোঁড়া খ্রীষ্টিয় মতবাদ, তবু ইসলামের বিরুদ্ধে এই শব্দটির অপপ্রয়োগ শুরু হয় বর্তমান শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে, অর্থাৎ মাত্র ২০/২৫ বছর পূর্ব থেকে; বিশ্বব্যাপী এক বিপুল ইসলামী জাগরণের সূচনার পটভূমিতে। ১৯৭৯ সালে ইরানে "ইশনা আসারিয়া" ভিত্তিক ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়ার পর এই অপপ্রয়োগ আরো জোরদার হতে শুরু করে। বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজমের পতন, ৬টি সাবেক সোভিয়েট রিপাবলিকে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ইউরোপে বোসনিয়া রাষ্ট্রের পত্তন, চেচনিয়ার জঙ্গী ইসলামী জিহাদ, আফগানিস্তানে ইসলামপন্থীদের উত্থান, আলজেরিয়ার নির্বাচনে ইসলামপন্থীদের বিপুল বিজয়, তুরস্কে ইসলামপন্থীদের সরকার গঠন, মালয়েশিয়ায় ইসলামী বিধি-বিধান ও মূল্যবোধের বিজয়, পাশ্চাত্যে বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের দ্রুত সম্প্রসারণ, খোদ ওয়াশিংটনে লুই ফারাহ খানের নেতৃত্বে দশ লক্ষাধিক কৃষ্ণ মুসলমানের সমাবেশ, অর্থনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক শক্তি হিসাবে মুসলিম বিশ্বের উত্থান ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদী ও খ্রীষ্টান অধ্যুষিত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই শব্দটির ব্যাপক অপপ্রয়োগ শুরু করে।

লক্ষ্যণীয়, বিশ্বের অনেক ধর্মে বা ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই অবৈজ্ঞানিক গোঁড়ামী ও আচার-অর্চনা রয়েছে, রয়েছে অন্য ধর্মের প্রতি উন্মত্ত অসহিষ্ণুতা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদেরকে মৌলবাদী বা উগ্রপন্থী বলে অভিহিত করা হচ্ছেনা। যেমনঃ উগ্র ইহুদী বা জঙ্গী হিন্দুদের পাশ্চাত্য দুনিয়া তেমন একটা মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে না। এতে

এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বেছে বেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই এই শব্দটির অপপ্রয়োগের মূলে রয়েছে আর্থ-রাজনৈতিক কারণ। আর্থ-রাজনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক শক্তি হিসাবে ইসলামী দুনিয়ার উত্থানকে প্রতিহত করাই নয়া সাম্রাজ্যবাদ-আগ্রাসনবাদের নিরঙ্কুশ স্বার্থ। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী-আগ্রাসনবাদীরা মুসলিম নামধারীদের ভেতর থেকে দালাল-সেবাদাস সৃষ্টিতেও অত্যন্ত তৎপর। এজন্য আর্থিক সুবিধা বা উৎকোচ প্রদান, যৌনতা ও যথেচ্ছাচারের সুবিধা প্রদান, মিডিয়ায় প্রচারের সুযোগ প্রদান, মস্তক ধোলাই ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়া তারা অবলম্বন করে। সাম্রাজ্যবাদী-আগ্রাসনবাদীরা মনে করে "লাল পতাকার বিরুদ্ধে লাল পতাকা" যেমন অধিকতর কার্যকর ঠিক তেমনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমান নামধারীদের লেলিয়ে দিতে পারা তাদের স্বার্থ হাসিলে অধিকতর ফলপ্রসূ। বাংলাদেশে এইরূপ মুসলিম নামধারী ইসলামদ্রোহীরা নিজেদের সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করে। সত্যিকার সেক্যুলাররা সকল ধর্মেরই বিরোধী হলেও, এইসব মুসলিম নামধারী সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা শুধুমাত্র ইসলাম তথা আল্লাহ, কুরআন, সুন্নাহ, ইবাদত ইত্যাদিরই বিরোধিতা করে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের গোড়ামী, উগ্রতা, এমনকি উগ্র সহিংসতাকেও সমর্থন করে। যেমন, ডঃ মুঞ্জে, সাভারকার, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ যখন ঘোষণা করেন মুসলমানরা ভারতের মাটির সন্তান নয়; সুতরাং ভারতে থাকার কোন অধিকার তাদের নেই কিংবা বাল থ্যাকারে যখন বলেন, মুসলমানদের পাছায় লাথি মেরে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে কিংবা ভারতের সহিংস হিন্দুরা যখন মুসলমানদের ওপর হামলা চালায় ও মসজিদ ভেঙ্গে দেয় কিংবা ভারতীয় সৈন্যরা যখন কাশ্মীরের মুসলিম রমণীদের ধর্ষণ করে, তখন বাংলাদেশের তথাকথিত এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এসব কর্মকাণ্ডকে অন্ধভাবে সমর্থন করে, এরা সমর্থন করে ইসরায়েল কর্তৃক মুসলিম নিধন ও আল আকসা মসজিদ অপবিত্রকরণসহ যাবতীয় ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী কর্মকাণ্ডকে। এরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনকে বলে মৌলবাদ, কিন্তু রামরাজ্য কায়েমের তৎপরতাকে দেয় সমর্থন। এরা প্রতিমাপূজাকে বলে প্রগতিশীল, নিরাকার আল্লাহর উপাসনাকে বলে অন্ধ গোঁড়ামী। এতে মনে হয়, এরা প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ বা স্যাকুলারও নয়, এরা নিছক ইসলামদ্রোহী মাত্র এবং এদের এই ইসলামদ্রোহিতার পেছনে আছে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত হীন, বিকৃত স্বার্থ।

পাঁচ.

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের সংগে ইসলামের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি ধর্ম প্রধানতঃ সদাচার, উপাসনা ইত্যাদি বিষয়েরই সমাহার। বেদ-উপনিষদ, ত্রিপিটক, বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, আইন ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যাপারে

কোন সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা বা রূপরেখা প্রদত্ত হয়নি। এইসব ধর্মের প্রবর্তকরা নিজেরা চর্চা ও স্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্র, অর্থনীতি ইত্যাদির কোন সুনির্দিষ্ট মডেলও রেখে যাননি। যীশু খ্রীষ্ট কোন রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি। গৌতম বুদ্ধ রাজপুত্র হলেও সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্যে চলে গিয়েছিলেন, রাজ্যশাসন করেননি। চতুর্বেদের রচয়িতা ঋষিরাও রাষ্ট্রনায়ক, সেনাপতি, বিচারপতি ইত্যাদি হিসেবে কোন ভূমিকা পালন করেননি। শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের প্রবর্তক নন, তাঁরা ভগবানের অবতার। এঁরা দু'জন অবশ্য রাজ্য শাসন করেছেন। কিন্তু তাঁরাও রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির এমন কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামো রেখে যাননি, যার প্রতিষ্ঠা তাঁদের অনুসারীদের জন্য বাধ্যতামূলক। ফলে, যে কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ কাঠামোর সংগে এসব ধর্মের কোন বিরোধেরও কোন প্রশ্ন নেই, সংহতিরও কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ইসলাম ধর্মের ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদিকে ইবাদত থেকে আলাদা করার কোনই সুযোগ নেই। ইসলাম একটি সামগ্রিক ও গ্রথিত জীবন ব্যবস্থা।

পবিত্র কুরআনে রাষ্ট্রব্যবস্থা, শাসননীতি, অর্থনীতি, বণ্টননীতি, বিচার ব্যবস্থা, কূটনীতি, সমরনীতি, অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আচরণ ইত্যাদি থেকে শুরু করে সম্পত্তির বাঁটোয়ারা ও যৌনজীবন পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া আছে এবং তা সর্বতোভাবে মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা কি এই কিতাবের (অর্থাৎ কুরআনের) কোন অংশের প্রতি বিশ্বাস রাখো এবং কোন অংশকে অবিশ্বাস করো। যারা এরূপ করো, তাদের কি শাস্তি হতে পারে, পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও কিয়ামতের দিন ভীষণ আজাব ব্যতীত?" (সূরা বাকারা ঃ ৮৫)। পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলা হয়েছে উসওয়াতুন হাসানা বা মহত্তম উদাহরণ এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ "আতিয়ুল্লাহ ওয়া আতিয়াররাসূলা" অর্থাৎ আল্লাহকে অনুসরণ করো এবং রাসূল (সা.)কে অনুসরণ করো। আর এই রাসূল (সা.) তো সেই প্রেরিত পুরুষ, যিনি একাধারে ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারক, সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং প্রধান নির্বাহী। মসজিদে নববী ছিল তাঁর সেক্রেটারিয়েট। তাঁর সচিবালয়ে নিরাপত্তা (পুলিশ), প্রতিরক্ষা, অর্থ ও হিসাব, বিচার, নগর উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসহ ১৭টি বিভাগ ছিল। এক কথায় তিনি রাষ্ট্র, সমাজ, আইন ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সশস্ত্র বাহিনী, কূটনীতি, ন্যায়নীতি (Ethics) ইত্যাদির জীবন্ত মডেল উপস্থাপন করে গেছেন। এই মডেলই হুবহু অনুসরণ করেছেন তাঁর পরবর্তী চার খলিফা। বলা বাহুল্য, এসকল দিকসহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-র জীবন ও কর্মের সকল দিকের অনুসরণও প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। কুরআন সুন্নাহর সমগ্র বিধিবিধানকে গ্রহণ না করে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করে মুসলমান থাকার কোনই সুযোগ নেই।

ইসলামই বিশ্বের একমাত্র ধর্ম, যে ধর্মে জ্ঞান অর্জনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, জ্ঞান অর্জন প্রতিটি মুসলিম নর ও নারীর জন্য ফরজ করা হয়েছে, (ইবনে মাজাহ)। বলা হয়েছে, এক রাত্রির জ্ঞান সাধনা হাজার বছরের (নফল) ইবাদতের চেয়ে উত্তম। পবিত্র কুরআনে বারংবার তাগিদ দেয়া হয়েছে আল্লাহর সৃষ্টির ব্যাপারে গবেষণা ও জ্ঞান আহরণের জন্য। যেমন, "নিশ্চয়ই আসমান (অর্থাৎ মহাবিশ্ব) ও পৃথিবীর সৃজনে, দিবারাত্রির পর্যায়ক্রমিক আবর্তনে, মানুষের জন্য লাভজনক পণ্য নিয়ে সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজসমূহে, আল্লাহ্ কর্তৃক আসমান (অর্থাৎ ভাসমান মেঘমালা) থেকে বর্ষিত পানিতে, অনুর্বর হওয়ার পর জমিকে আবার সতেজ করার মধ্যে, পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া যাবতীয় জীবজন্তুতে, বায়ু রাশির পরিবর্তনে, আসমান ও জমিনের মাঝে অবস্থিত মেঘমালায় এবং এরকম যাবতীয় কিছুতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে প্রমাণসমূহ" (সূরা বাকারা ঃ ১৬৪)।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই কম্প্যুটার, রোবট, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্পেসশীপের যুগে ১৪০০ বছর আগে প্রবর্তিত ইসলামী বিধিব্যবস্থা কায়েম করা আদৌ সম্ভবপর কিনা। এটা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা, যোগাযোগ, সমরসম্ভার, সমাজ কাঠামো, মানুষের জীবনধারা, চিন্তাচেতনা ও সংস্কৃতির জগতেও পরিবর্তন সাধিত হবে, হচ্ছেও। বলাবাহুল্য, এই ক্রমবিবর্তনশীল পরিস্থিতির উপলব্ধি একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে এবং যেকোন পরিস্থিতিতে কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধিবিধানসমূহের প্রায়োগিকরূপ খুঁজে পাওয়ার সুবিধার্থে ইজতিহাদ, ইজমা ও কিয়াস-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে বিজ্ঞান প্রযুক্তির যতো অগ্রগতিই হোক না কেন, ইসলাম স্থবির, অনুপযোগী বা অকেজো (obsolete) হয়ে যাওয়ার কোনই সুযোগ নেই। এজন্যই John Overt Voll তাঁর Change in the Modern World গ্রন্থে বলেছেন, "Islam is a dynamic force in the contemporary world."

অতএব ইসলামের সংগে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা আধুনিকতার কোন বিরোধ তো নেইই, বরং ইসলামই বিজ্ঞান প্রযুক্তির সুষ্ঠু ও কল্যাণকর বিকাশ এবং সুস্থ আধুনিকতা ও প্রগতির সবচেয়ে কার্যকর ভিত্তি ও চালিকাশক্তি (guiding factor) হতে পারে।

ইসলামে সাম্প্রদায়িকতার কোনই স্থান নেই। পবিত্র কুরআনে শুধু যে, "লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালীয়াদ্বীন" বা যার যার ধর্ম তার তার বলেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তা নয়। পবিত্র কুরআনে একথাও বলা হয়েছে, "হে রাসূল, আপনার রব যদি চাইতেন যে প্রতিটি মানুষকে ঈমানের রাস্তায় আনয়ন করবেন, তবে তিনি তা অবশ্যই করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা চান না। মানুষ দেখে শুনে সত্যকে গ্রহণ কিংবা বর্জন করুক, তিনি তাই চান" (সূরা মায়েদা ঃ ৪৮)। আরো বলা হয়েছে, "আপনার রব এমন নন যে, কুফরের

জন্য জনপদসমূহ ধ্বংস করে দেন, ওই জনপদের লোকেরা সৎকাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও" (সূরা হুদ ঃ ১১৭)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মজলুম যদি বিধর্মীও হয়, তবু তার দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়" (তরগিব, হাসনে হাসিনা, হাদিসে কুদসী) বস্তুতঃ একটি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যে সামাজিক নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন, তা অন্য কোন ব্যবস্থায় কল্পনা করাও সম্ভবপর নয়। ঐতিহাসিক গীবন, মুইর, আর্নল্ড টয়েনবী প্রমুখ তাই ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্মীয় সম্প্রীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন।

সুতরাং, যে ধর্মে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশকে ইবাদতের মতোই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়, যে ধর্ম গতিশীল ও সার্বজনীন, যে ধর্মে যে কোন পরিস্থিতিতে শাশ্বত বিধিবিধানের প্রায়োগিক রূপ খুঁজে পাওয়ার অন্তর্গত (in built) ব্যবস্থা সন্নিবেশিত রয়েছে, যে ধর্ম সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার কঠোর বিরোধি, যে ধর্ম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার কল্যাণকামী, সেই ধর্ম বা সেই ধর্মের অনুসারীরা কিভাবে 'মৌলবাদী' বা Fundamentalist পদবাচ্য হতে পারে? Fundamentalism এর যে পাঁচটি মৌল ভিত্তি তার সংগেই বা ইসলামের কোথায় সাযুজ্য?

বাস্তবতঃ ইসলাম ও প্রকৃত মৌলবাদ সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। তারপরও, কেউ যদি অন্ধভাবে ইসলামকে মৌলবাদ এবং ইসলামের যথার্থ অনুসারীদের মৌলবাদী বলে গালাগাল দিতেই থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে, হয় ওই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নয় তার বা তাদের ইসলামদ্রোহিতার পেছনে রয়েছে কোন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত হীন স্বার্থ, রয়েছে মেধা ও চরিত্রের বিকৃতি। আর অন্ধ একগুঁয়েমির নামও যদি মৌলবাদ হয়, তাহলে ইসলামকে না জেনে এবং জানার কোন তোয়াক্কা পর্যন্ত না করেই, যারা প্রাণপণ ইসলামদ্রোহিতায় লিপ্ত হন, তাঁদেরকেই এক ধরনের মৌলবাদী বলা যায়।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, খ্রীষ্ট ধর্মে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট কাঠামো ও রূপরেখা না থাকা সত্ত্বেও বর্তমান আর্থ-সামাজিক-পারিবারিক নৈরাজ্য ও হতাশার কবল থেকে মুক্তির আর্তিতে বিশ্বের কোটি কোটি খ্রীষ্টানও ধর্মের কাছে ফিরে যেতে শুরু করেছেন। ম্যাসাচুসেটস্-এর হ্যারিটাজ ফাউন্ডেশন ১৯৯৬ সালে ২৫ জানুয়ারী "Why Religion Matters : The Impact of Religious Practice on Social Stability" শীর্ষক একটি ব্যাপকভিত্তিক ও গভীর অনুসন্ধানমূলক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে। তাঁদের জরীপে দেখা গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ৯৪% কৃষ্ণাঙ্গ এবং ৮৭% শ্বেতাঙ্গই নিয়মিত উপাসনা করেন। এঁদের মধ্যে ৫৭% উপাসনায় নিমগ্ন হন প্রতিদিন। তাঁদের জরীপ থেকে আরো বেরিয়ে এসেছে ঃ

- পারিবারিক জীবনের সংহতি ধর্মনিষ্ঠার সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত;
- চার্চ গমনকারীদের মধ্যে তালাকের সংখ্যা কম এবং তাঁরা দাম্পত্য জীবনে অধিকতর পরিতৃপ্ত;
- ধর্ম পালন দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক;
- ধর্ম বিশ্বাস ও পালন নৈতিক চরিত্র ও নৈতিক বিচারবুদ্ধির অন্যতম নিয়ামক;
- ধর্ম পালন, আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি, বিবাহ-বহির্ভূত সন্তান, অপরাধ ও তালাকের প্রধান প্রতিষেধক;
- ধর্ম সুস্বাস্থ্যদায়ক।

ছয়.

মানবেন্দ্র নাথ রায় (এম, এন, রায়) ছিলেন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং বিশ্বের প্রথম কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি লেনিনের সহকর্মী। মানবেন্দ্র নাথ রায়, তাঁর "ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান" গ্রন্থে লিখেছেন, "ইসলাম ইতিহাসের এক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, মানব সভ্যতার অগ্রগতির অপরিহার্য সহায়। নতুন সামাজিক সম্পর্কের বাণী নিয়ে এর আদর্শ গড়ে উঠেছে, আর তার ফলে মানব মনের হয়েছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।.... একথা অবধারিত সত্য যে, ইসলাম যে তত্ত্ব ও আদর্শবাদের জন্ম দিয়েছে তাই কালে কালে জগতে নানা সমাজ বিপ্লবে সহায়তা করেছে। জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে সে তত্ত্ব ও আদর্শবাদ হয়েছে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রেরণা ও দর্শনের যুক্তিবাদ। সমাজে নব নব বিপ্লবের বীজ বাঁচিয়ে রাখার যে গৌরব, ইসলামী সংস্কৃতিই সে গৌরবের একমাত্র অধিকারী।" তিনি আরো লিখেছেন, "ধর্মীয় গোঁড়ামী আর বিদ্বেষ-জর্জরিত অসংখ্য মানুষ এই ধর্মমতের সরল ও অনাড়ম্বর রূপের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হলো। যারাই এই নতুন ধর্মের আওতায় আশ্রয় নিল, তাদেরই এ ধর্ম দিল বিবেক বুদ্ধির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। ধর্মের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আর নিপীড়িতদের আশ্রয় রূপেই ইসলাম এমনিভাবে মাথা তুলে দাঁড়ালো।
...... ইসলামের বিস্ময়কর সাফল্যের হেতু যেমন আধ্যাত্মিক, তেমনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক।"

ইসলামের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক গীবন তাঁর Decline and Fall of the Roman Empire গ্রন্থে বলেন, মোহাম্মদ তাঁর খ্রীষ্টান প্রজাদের বিনা দ্বিধায় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন তাদের ধনসম্পত্তি ও ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাধীনতা, আরো দিয়েছিলেন তাদের স্বাধীনভাবে পূজার্চনা করার অধিকার। এই কল্যাণকর সহনশীলতার নীতি অত্যন্ত কঠোরতার সংগে অনুসরণ করা হতো। শুধু যে

মোহাম্মদের পরবর্তী উত্তরাধিকারীরাই এ নীতি পালন করেছেন তা নয়; মুসলিম শাসক পরম্পরায় এ নীতি প্রতিপালিত হয়েছে।"

ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা মহাত্মা গান্ধী ইসলাম প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> "I wanted to know the best of one (i.e, Prophet S.A) who holds today undisputed sway over the hearts of millions of mankind... ... I became more than convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet, the scrupulous regard for his pledges, his intense devotion of his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle. .... When I closed the second volume (of the prophet's Biography), I was sorry there was not more for me to read of the great life."

ঐতিহাসিক Gibbon ইসলামের উদারতা প্রসংগে বলেছেন,

> "In the long history of the world, there is no instance of magnanimity and forgiveness, which can approach those of Mohammad, when all his enemies lay at his feet and the forgave them one and all."

ইসলাম প্রসংগে পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু বলেছেন, "ইসলাম ধর্মের বাণী হলো, ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সবাই ভাই ভাই। এতে করে মানুষ গণতন্ত্রের একটা আঁচ পেলো। তৎকালে খ্রীষ্ট ধর্ম যেরূপ বিকৃত হয়ে পড়েছিল, তাতে এই ভ্রাতৃত্বের বাণী কেবল আরব জাতির মধ্যেই নয়, অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মনেও সাড়া জাগিয়েছিল।"

যাঁরা আজ ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের মৌলবাদী বলে গালাগাল করছেন, তাঁদের কাছ থেকে জানতে ইচ্ছে করে, তাঁরা কি মানবেন্দ্র নাথ রায়ের চেয়েও বেশী প্রগতিশীল ও বস্তুবাদী? তাঁরা কি মহাত্মা গান্ধীর চেয়েও অধিক ভারতীয়?

বর্তমান দুনিয়ায় ইসলামের যতো দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে, অন্য কোন ধর্মের ক্ষেত্রেই তা ঘটছেনা। আগামীতে মুসলমানরাই হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। ইসলামের এই পুনর্জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য জগৎ ইসলামের প্রতি দলন ও তোষণ, উভয় প্রকার নীতিই যুগপৎ গ্রহণ করেছে। ১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

হওয়ার পর থেকেই প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন মুসলমানদের প্রতিটি পবিত্র দিবসে নিয়মিত শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনবাণী দিয়ে যাচ্ছেন। ফার্স্ট লেডী হিলারী ক্লিনটন মুসলমানদের জন্য খুলে দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের দরজা। ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে হোয়াইট হাউসেই তিনি আয়োজন করেন এক সংবর্ধনার।

বৃটেনের ভাবী রাজা প্রিন্স চার্লস ২৭ আক্টোবর ১৯৯৩ সালে অক্সফোর্ডে "The Spirit of Islam is Equity and Compassion" শীর্ষক বক্তৃতামালায় ধর্ম ও ইসলামের সপক্ষে এক চমৎকার বক্তব্য দেন। তখন থেকে প্রতিটি সুযোগেই তিনি ইসলাম সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসামূলক বক্তব্য দিয়ে আসছেন।

বিশ্বব্যাপী কিছু মানুষ ইসলামকে 'মৌলবাদী' ও সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করতে অত্যন্ত তৎপর বটে। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে হয় না। সম্প্রতি Chicago Council of Foreign Relations পাশ্চাত্য দুনিয়ার জন্য কোন কোন বিষয় হুমকি, তা চিহ্নিত করার জন্য এক জরীপ কাজ চালায়। এতে কেউ "ইসলামী মৌলবাদ"-কে হুমকি হিসাবে চিহ্নিত করেনি। Los Angeles Time অপর এক জরীপে এমন একটি প্রশ্ন রেখেছিল ঃ "ইসলাম কথাটা শুনলে আপনার মনে প্রথম প্রতিক্রিয়া কি হয়? মাত্র ০৬% অংশগ্রহণকারী বলেছে "সন্ত্রাস। এই ০৬%-ও এরকম উত্তর দিয়েছে বিভিন্ন অপপ্রচারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে।

অথচ এই বাংলাদেশে কিছু মানুষ ইসলামকে "মৌলবাদ" ও গোঁড়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। তাঁরা এমন ভাব করছেন যেন, ইসলামকে অচিরেই স্তব্ধ করতে না পারলে জগৎ সংসার রসাতলে যাবে।

সাত.

বাংলাদেশে ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাশালীদের বিরুদ্ধে "মৌলবাদ" শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় আশির দশকে। ভারতীয় একশ্রেণীর পত্রপত্রিকা ও বুদ্ধিজীবীই সম্ভবতঃ এর উদ্গাতা। এঁদের প্রভাবে বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক "বুদ্ধিজীবী" ও রাজনৈতিক নেতানেত্রীও শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। এইসব ইসলামদ্রোহীরা বোধগম্য কারণেই একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া গ্রহণ করেন। এঁদের বক্তব্য হলো ঃ ইসলামকে অনুসরণ করার কথা যেই-ই বলবে, সেই-ই গোঁড়া ও মৌলবাদী এবং যে-ই ভারতীয় আগ্রাসনবাদের বিরুদ্ধে কোন উচ্চারণ করবে, সেই-ই সাম্প্রদায়িক। এঁরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে দাবী করেন। এঁদের মতে ধর্মনিরপেক্ষ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হওয়ার শর্ত প্রধানতঃ তিনটি ঃ

১. ইসলামী আচার-আচরণ ও নীতিআদর্শ কোনক্রমেই অনুসরণ করা যাবে না। ইসলামী চিন্তাচেতনাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য জীবনপণ প্রয়াস চালাতে হবে। ইসলামের নাম নিশানা মুছে দিতে হবে।

২. ভারতীয় আগ্রাসনবাদ যাই-ই করুক না কেন অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করে, তাকে প্রাণপণ সমর্থন দিতেই হবে। যারাই ভারতীয় আগ্রাসনবাদের সমালোচনা করবে তাদেরও নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

৩. ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের কায়েমকে মহাবিভ্রান্তি ও জঘন্য ভুল বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং এই ভুল-বিভ্রান্তি সংশোধন করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে।

এই তিনটি শর্তের ব্যাপারে যারা দ্বিমত পোষণ করে, তাদেরকে এইসব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের গোঁড়া, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, পাকিস্তানপন্থী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ইত্যাদি বলে গালাগাল করেন। তাঁদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলে, তাঁরা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণকারী, এমনকি সেক্টর কমান্ডারদের পর্যন্ত পাকিস্তানপন্থী, মৌলবাদী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী, এমনকি রাজাকার বলে গালাগাল করতেও কোন দ্বিধাবোধ করেন না। প্রসংগতঃ মুক্তিযুদ্ধকালীন নবম সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল-এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। অপরদিকে, ইসলামদ্রোহিতা, ভারতীয় আগ্রাসনবাদের অন্ধ স্তুতি এবং ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণায় যাঁরা সোচ্চার, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের ধারে কাছে না গেলেও, এমনকি পাকিস্তানী হানাদারদের দোসর-অনুচর হিসেবে কাজ করলেও, তাঁদেরকে এইসব "ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা" মুক্তিযুদ্ধের মহান সৈনিক, যথার্থ বাঙালী ইত্যাদি বিশেষণে অভিষিক্ত করেন। ঐতিহাসিক ও বস্তুগত সত্যকে অস্বীকার করতেই যেন এইসব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আট.

ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন যে, ১৯৪৭ সালে বঙ্গকে বিভক্ত করার পেছনে মুসলিম লীগ বা মুসলমানদের কোন ভূমিকা ছিল না। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে কেবিনেট মিশন অখণ্ড ভারতকে তিন গ্রুপে ভাগ করে স্বাধীনতা প্রদানের যে পরিকল্পনা হাজির করেন, তা মুসলিম লীগ হুবহু মেনে নেয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 'গ' গ্রুপে ছিল যুক্ত বঙ্গ ও আসাম। লর্ড ওয়াভেল কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অটল থাকায় ক্ষুব্ধ জওহর লাল নেহেরু স্বয়ং লন্ডন গিয়ে অনেক দেনদরবার করে তাঁর বন্ধু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করিয়ে নেন। ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সকল মুসলমান সদস্যই বঙ্গ বা বেঙ্গলকে অখণ্ড রাখার পক্ষে ভোট দেন। কিন্তু শরৎ চন্দ্র বসু ও কিরণ শঙ্কর রায় ব্যতীত সকল হিন্দু সদস্যই ভোট দেন বঙ্গকে বিভক্ত করার পক্ষে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও অবিভক্ত বাংলার পক্ষেই সম্মতি দিয়েছিলেন।

বস্তুতঃ হিন্দুরা বিশেষতঃ বর্ণ হিন্দুরা কোনদিনই ভারতের মুসলমানদের ভূমিপুত্র বলে মেনে নেয়নি, স্বীকার করেনি মুসলমানদের জাতিত্ব ও অধিকার। ফলে, ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে হিন্দু আধিপত্যসম্পন্ন রাষ্ট্র ভারত এবং মুসলিম আধিপত্যসম্পন্ন রাষ্ট্র পাকিস্তান কায়েম ব্যতীত অপর কোন গত্যন্তর ছিল না।

ঐতিহাসিক অনিবার্যতার পটভূমিতে পাকিস্তান কায়েম হলো বটে, কিন্তু এর দুই অংশের মধ্যে রইলো এক হাজার মাইলের এক দুস্তর ব্যবধান।

ভৌগলিক সংলগ্নতা বা Contiguity হীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি ও স্থায়িত্বের উপায় ছিল মাত্র দু'টিঃ এক. লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক কনফেডারেশন গঠন এবং দুই. কুরআন সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র গঠন। কিন্তু এর কোনটিই করা হয়নি।

এই ভৌগলিক অসংলগ্নতা বা non-contiguity. নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত সংহতিহীনতা, রাজধানী ও সকল কর্মকাণ্ডের হেড কোয়ার্টার্সই রাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে স্থাপিত হওয়া এবং সর্বোপরি সামরিক, সিভিল ও অর্থনৈতিক এলিট শ্রেণী নিরঙ্কুশভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক হওয়ার ফলশ্রুতিতে স্বভাবতই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিপুল বৈষম্য গড়ে উঠতে থাকে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় বৈষম্য-বিরোধী স্বাধিকার আন্দোলন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। গণতন্ত্রের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের হাতে সরকার গঠনের ভার ছেড়ে দিলে হয়তো কোন জটিলতা বা সমস্যাই সৃষ্টি হতোনা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ও তাঁর সমর্থক কতিপয় সামরিক কর্মকর্তার কায়েমী স্বার্থবাদীতা, ক্ষমতাপরায়ণতা, আঞ্চলিকতা, একগুঁয়েমী ও উগ্রতা এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এই গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতার ফলশ্রুতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি। ফলে দেখা দেয় এক দুঃসহ অচলাবস্থা। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে পূঞ্জীভূত হতে থাকে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। এমতাবস্থায়, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রে পাকিস্তানী হানাদাররা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর চাপিয়ে দেয় বীভৎস ভয়াবহ অপারেশন সার্চ লাইট। অপ্রস্তুত রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ অবস্থায় যে যেদিক দিয়ে, যেমন করে পারেন, তেমন করে পালিয়ে ভারতে গিয়ে ওঠেন। আর হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন সেনাবাহিনী, ইপিআর ও পুলিশের বাঙালী অফিসার ও জওয়ানরা এবং সে সঙ্গে বাংলাদেশের তাবৎ আবাল বৃদ্ধ বণিতা, বিশেষতঃ তরুণ ছাত্র-কৃষক-শ্রমিকরা। ঘটনার পরপরই ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম লোকসভায় ঘোষণা করেন, "ভগবান প্রদত্ত এই সুযোগ হেলায় হারানো ভারতের জন্য উচিত হবে না।" বাস্তবিকই চিরশত্রু

পাকিস্তানকে ভাঙার এই সুযোগ কাজে লাগাতে ভারত কোন কার্পণ্যই করেনি। ১৯৭১-এ পাকিস্তানী হানাদাররা লড়ছিল বাংলাদেশের সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে। আর গোটা জনগণের বিরুদ্ধে লড়াই করে পৃথিবীর কোন শক্তিই কখনো জিততে পারেনা। পাকিস্তানী হানাদারদের পক্ষেও এ লড়াইয়ে জেতা কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না।

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যেই দু'টি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এক, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় অনিবার্য ও সময়ের ব্যাপারমাত্র। দুই, মুক্তিযুদ্ধ আরো দীর্ঘতর হলে নিস্ক্রিয় রাজনীতিবিদদের হাত থেকে নেতৃত্ব অচিরেই পুরোপুরিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চলে যাবে। এমতাবস্থায়, ভীত সন্ত্রস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিশেহারা হয়ে দিল্লীতে ছুটে যান এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ধর্না দিয়ে পড়েন, যেন ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের তড়িৎ সমাপ্তি ঘটায় এবং তাদের নেতৃত্ব রক্ষা করে। অচিরেই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজী ভারতীয় জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। শুরু হয় প্রতিবেশী উঠতি পরাশক্তি কর্তৃক নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, আধিপত্য ও আগ্রাসনের এক নতুন অধ্যায়।

মুক্তিযুদ্ধ এক বাস্তব সত্য। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাও এক বাস্তব সত্য। এটাও অবধারিত যে, বাংলাদেশ আর কখনোই পাকিস্তান হবে না। পাশাপাশি, এ সত্যকেও স্বীকার করার কোন জো নেই যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম না হলে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ কায়েম কোনক্রমেই সম্ভবপর হতো না। পাকিস্তান কায়েম না হলে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চল অখণ্ড ভারতের বঙ্গপ্রদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই বহাল থাকতো। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে বাংলাদেশের যে সীমানা ও মানচিত্র, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান না হলে এই সীমানা ও মানচিত্রেরই অস্তিত্ব সৃষ্টি হতোনা। এমতাবস্থায়, ভারতের বঙ্গপ্রদেশেরই সীমানাহীন একটি অংশ-বিশেষের পক্ষে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া কষ্মিনকালেও সম্ভবপর হতো না। এই বাস্তবতা স্বীকার করার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধ কোথায়? বরং এটাইতো বাস্তব সত্য যে, ১৯৪৭ সালে সৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তানই আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

একইভাবে এটাও বাস্তব সত্য যে, বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ মানুষ মুসলমান এবং দলমত নির্বিশেষে এঁদের অধিকাংশই ধর্মপ্রাণ মুসলমান। সুতরাং, এই মুসলমানদের ওপর ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থাৎ ধর্মহীনতা চাপিয়ে দেয়া কোনক্রমেই যথার্থ বা সম্ভব হতে পারে না।

নয়.

মোটকথা, ধর্মনিরপেক্ষতা, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ইসলাম ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত বাস্তবতা নিম্নরূপঃ

- সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার একমাত্র অর্থ ধর্মহীনতা, কোন ধর্মের অন্তর্গত না থাকা, ধর্মদ্রোহিতা। সেক্যুলারিজমের অন্য কোন অর্থ বা সংজ্ঞা নেই।
- ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ সম্পূর্ণরূপেই একটি গোঁড়া প্রোট্যাস্টান্ট খ্রীষ্টীয় মতবাদ, যার ভিত্তি বাইবেলের অভ্রান্ততা, যীশুর দেবত্ব, কুমারী মাতার গর্ভে যীশুর জন্ম, জগতের পাপক্ষয়ের জন্য যীশুর রক্তক্ষরণ ও সশরীরে যীশুর পুনরুত্থান। এই ৫টি মৌলভিত্তি ব্যতীত মৌলবাদ হতে পারে না। অতএব অন্য কোন ধর্মের সংগে মৌলবাদের কোন সম্পর্ক নেই।
- একজন মানুষ, যিনি কোন না কোন ধর্মের অন্তর্গত, তাঁর সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার কোনই সুযোগ নেই। তবে একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ অসাম্প্রদায়িক হতে পারেন, হতে পারেন অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল।
- ইসলাম জগতের অন্যান্য ধর্মের তুলনায় স্বতন্ত্র এজন্য যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলামে জাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সীমারেখা টানার কোন সুযোগ নেই। ইসলামে আল্লাহর হক (হক্কুল্লাহ) এবং সমাজের হক (হক্কুল ইবাদ) আদায় সমভাবে বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র, সমাজ, আইন, অর্থনীতি ইত্যাদি কায়েম বা কায়েমের সর্বাত্মক প্রয়াস। বাধ্যতামূলক শির্ক, কুফর, বিদআত এর পাশাপাশি সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নিপীড়ন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম বা জিহাদ। এইসব মৌল শর্ত অস্বীকারকারী কোনক্রমেই মুসলমান পদবাচ্য নন। কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধি-বিধানকে আংশিক গ্রহণ বা আংশিক বর্জনের কোনই সুযোগ নেই।
- ইসলামে সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামী, কূপমণ্ডুকতা, স্থবিরতা ইত্যাদির কোনই স্থান নেই। ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজ অমুসলমানদের জানমাল, ধর্মচর্চাসহ যাবতীয় মৌলিক অধিকারের সর্বোচ্চ গ্যারান্টি দিতে ধর্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য। ইসলামে জ্ঞানার্জন ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির চর্চার ওপর ইবাদতের সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বস্তুতঃ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে জিহাদ, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ইত্যাদিসহ যাবতীয় কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত বিধি বিধান ও আজ্ঞা পালন ইবাদতেরই অন্তর্গত।
- পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী বিধি-বিধানের প্রায়োগিক রূপ খুঁজে পাওয়ার জন্য ইসলামে রয়েছে ইজতিহাদ, ইজমা কিয়াস ইত্যাদি in-built ব্যবস্থা।

এরকম ব্যবস্থা অন্য কোন ধর্মতো দূরের কথা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বা কম্যুনিজমেও ছিল না (বস্তুতঃ এই স্থবিরতাই কম্যুনিজমের ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ)।

- অতএব, যে ধর্ম বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চা ও বিকাশকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়, যে ধর্ম সর্ব প্রকার অন্যায় অবিচার শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করে, যে ধর্ম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মৌলিক ও ধর্মীয় অধিকারের সর্বোচ্চ গ্যারান্টি দেয়, যে ধর্মে যেকোন পরিস্থিতির সংগে খাপ খাওয়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে, সেই ধর্মকে প্রতিক্রিয়াশীল, গোঁড়া সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা অন্যায় ও ধৃষ্ঠতারই নামান্তর; মৌলবাদ বলা তো প্রশ্নাতীত।
- বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজমের পতন এবং ইসলামের অপ্রতিরোধ্য পুনর্জাগরণের পটভূমিতে বর্তমান শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের এক শ্রেণীর মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে, 'মৌলবাদ' শব্দটির অপপ্রয়োগ শুরু করে। এর মৌল উদ্দেশ্য, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক শক্তি হিসাবে মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামী আদর্শের উত্থানকে প্রতিহত করা।
- বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমেই বাংলাদেশের সীমানা ও আয়তনের উদ্ভব। বস্তুতঃ সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানই বর্তমান বাংলাদেশ। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত না হলে আজকের বাংলাদেশের উদ্ভব কোনক্রমেই সম্ভবপর হতোনা।
- একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশের জন্ম। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে ছিলনা, এ যুদ্ধ ছিল পাকিস্তানী শাসকশোষক গোষ্ঠির শোষণ-নিপীড়ন বৈষম্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভিন্ন স্বার্থে এই মুক্তিযুদ্ধের সহায়তা প্রদান করেছিল, সেই রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এবং তাদের অন্ধ অনুসারীরা মনে করেছিল, এ যুদ্ধ ইসলামেরই বিরুদ্ধে। তারা আশা করেছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে অনৈসলামিকরণ বা De-Islamisation সহজেই সম্ভবপর হবে। এ জন্য বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি শব্দকে আদর্শ হিসাবে জুড়ে দেয়াও হয়েছিল।
- কিন্তু অচিরেই De-Islamisation প্রত্যাশাকারীদের মোহভঙ্গ ঘটে। দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণের ধর্মনিষ্ঠা দেখে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক গোষ্ঠি এবং তাদের বাংলাদেশী অনুচররা দিশেহারা হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে জনগণের মন-মানস ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সংগে সংগতি রেখে বাংলাদেশের সংবিধানেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে এখন

ধর্মনিরপেক্ষতার কথা নেই, স্রষ্টার অস্তিত্ব বিরোধী বস্তুবাদভিত্তিক সমাজতন্ত্রের কথাও অনুপস্থিত। বরং এর ৮ (এক) ধারায় বলা হয়েছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি"। ২ (ক) ধারায় বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম।" বলা বাহুল্য, এই ঘোষণা অন্যান্য ধর্মের স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়; বরং সম্পূরক। সংবিধানের এই পরিবর্তন ব্যাপক জনগণের মন-মানসের সংগে সংগতিপূর্ণ বিধায় এককালের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারও তা বহাল রেখেছেন বা রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

- এমতাবস্থায়, ক্ষিপ্ত ইসলামদ্রোহিরা আশির দশক থেকে বাংলাদেশের ইসলামনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে মৌলবাদ শব্দটির ব্যাপক অপপ্রয়োগ শুরু করে। লক্ষ্যণীয়, এইসব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষরা কিন্তু শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন, অন্য কোন ধর্মের নয়। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এঁদের সংগে কোন ইসলামবিরোধী চক্রের বিশেষ যোগসাজশ রয়েছে। এইসব ইসলামদ্রোহী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মৌল প্রতিপাদ্য নিম্নরূপঃ

  ক. ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের নির্মূল করতে হবে।

  খ. ভারতীয় আগ্রাসনবাদ ও উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী হিংস্রতার প্রতি অন্ধ সমর্থন দিতে হবে।

  গ. ইসলাম ব্যতীত অন্যকোন ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীর বিরোধিতা করা যাবে না। এবং

  ঘ. ১৯৪৭ সালের ভারতবিভক্তি ও পাকিস্তান সৃষ্টিকে মেনে নেয়া যাবে না।

- এইসব ইসলামদ্রোহী-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তাঁদের সংগে দ্বিমত পোষণকারীদের ঢালাওভাবে গোঁড়া, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, পাকিস্তানপন্থী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী, রাষ্ট্রদ্রোহী ইত্যাদি বলে অভিহিত করেন।

- আরো লক্ষ্যণীয় যে, ভোগবাদী ও Permissive সমাজের ভাঙন, নৈরাজ্য, হতাশা, অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে আজ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ধর্মের কাছে ফিরে যাওয়ার এবং ধর্মের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তি খুঁজে পাওয়ার আগ্রহ প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। সাবেক কম্যুনিস্ট দেশসমূহের জনগণ, যাদের অনেকে ধর্ম কি, তা দেখেনইনি, তারাও কম্যুনিজমের পতনের সংগে সংগেই বহুলাংশে ধর্মের কাছে ফিরে গেছেন।

- ইসলাম সম্পর্কে আজ বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছে এক নতুন মূল্যায়ন। ইসলাম ও ইসলামী বিশ্বের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে ব্যর্থ হয়ে এখন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ইসলাম বা মুসলমান তোষণের নীতিও গ্রহণ করেছে। ইসলামে এই শক্তি, স্থায়িত্ব ও কালজয়ীতার কারণ কি, তা জানার জন্য রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রনীতিবিদরা

নতুনভাবে আগ্রহী হয়েছেন। ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছেন চার্লস, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন প্রমুখ। হিলারী ক্লিনটন হোয়াইট হাউসে ঈদ-উল-ফিতরের সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন। তাঁদের কন্যাকে শেখাচ্ছেন কুরআন তিলাওয়াত।

- বিশ্বব্যাপী ধর্মের, বিশেষতঃ ইসলামের এই নবজাগরণ, বাংলাদেশের উদ্ভবের ইতিহাস, বাংলাদেশের জনগণের ঐতিহ্য, বিন্যাস ও মন-মানস এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের সংবিধানের পটভূমিতে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা ধরে ইসলামদ্রোহিতা করছেন, তাঁরা শুধু বিশ্বের চলমান বাস্তবতারই বিরোধিতা করছেন না; তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে তো বটেই এমনকি মৌলবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি Concept-এর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কেও মহা অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটাচ্ছেন। সর্বোপরি তাঁরা বাংলাদেশের সংবিধান বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছেন। এ ধরনের তৎপরতা সংবিধান লঙ্ঘন ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার আওতাভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য বটে।

নীরদ সি. চৌধুরী তাঁর The Autobigraphy of an Unknown Indian গ্রন্থে বলেছেন ঃ

> In the Islamic world we see the hold of one great political concept, arising from the creation and sway of the Islamic universal state, the historic Caliphate and constituting theoritical embodiment of the idea of such state" (P. 504)

ভারতবর্ষে হিন্দু নবজাগরণের উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলেছেন ঃ

> "The Mohammedan conquerers of India came as a salvation to the downtrodden, to the poor. That is why one fifth of our people became Mohammedans .... It would be height of madness to think it was all the work of sword and fire". (Selections from Swami Vivekanda, P. 206)

অতএব যুদ্ধবাজ, সন্ত্রাসবাদী, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, গোঁড়া ইত্যাদি শব্দ আর যার বিরুদ্ধেই প্রয়োগযোগ্য হোকনা কেন, ইসলাম বা ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কোনই যৌক্তিক বা বৈধ সুযোগ নেই। রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইন ব্যবস্থা ইত্যাদি থেকে ধর্মকে আলাদা রাখার নীতি বা তত্ত্ব ইসলামের ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়।

ইসলামী বিধিবিধান-এর সংগে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের কোনই বিরোধ নেই। বরং ইসলামদ্রোহিতাই বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর।

মৌলবাদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মৌলবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা আধুনিক বিশ্বে খুবই আলোচিত ও সম্ভবতঃ সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর তিনটি শব্দ। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এই শব্দগুলোর চাতুর্যপূর্ণ প্রয়োগ অর্থ ও ভাবের এমনসব স্ব-বিরোধী রূপ প্রকাশ করে যে, এর ফলে পাঠক ও শ্রোতার চিন্তার জগতে গোলক ধাঁধার সৃষ্টি হয়। সভ্যতার সৌধ নির্মাণে এই শব্দত্রয় কোন ইতিবাচক অবদান রাখতে না পারলেও জগত সংসারে বিপর্যয় সৃষ্টিতে এরা প্রতিনিয়ত বিধ্বংসী ও বিভীষিকাময় ভূমিকা পালন করে চলেছে। আর তাই এমনও কখনও মনে হয় মানবের শব্দ ভান্ডারে এই বিভ্রান্তিকর ও বিধ্বংসী শব্দত্রয়ের জন্ম না হলেই ভালো হতো।

মৌলবাদ

মৌলবাদ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ (Fundamentalism); এই শব্দের জন্ম হয়েছে যেমন খ্রীষ্টান পরিবারে তেমনি এর বর্ধন ও পুষ্টিসাধনও হয়েছে খ্রীষ্টীয় সমাজে। এই শব্দটির সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের কোন সংশ্রব কোনকালে ছিল না আজও নেই। খ্রীষ্টীয় ইতিহাসের এক পর্যায়ে ধর্ম কেন্দ্র, কর্ম কেন্দ্র এবং আধুনিকতার মধ্যে বিভক্তি ও বিরোধিতা থেকে মৌলবাদ ব্যবহারের সূত্রপাত হয়। (Webster's Dictionary) মৌলবাদের পরিচয় লিখেছে এইভাবে ঃ

> "A belief that the Bible is to be accepted literally as an inherant and infallible spiritual and historical document; an early 20th century US Protestant movement stressing this belief."

অর্থাৎ "মৌলবাদ হচ্ছে একটি বিশ্বাস যার দৃষ্টিতে বাইর থেকে আক্ষরিক অর্থে বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এই বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব প্রদানকারী বিশ শতকের প্রথম দিকটার যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলন।"

Oxford Dictionary of current English (AS Hornby) Fundamentalism এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এইভাবে ঃ

> "Maintenance of literal interpretation of the traditional beliefs of the Christian religion (such as the accuracy of everything in the Bible), in opposition to more modern teachings."

অর্থাৎ "তুলনামূলকভাবে বেশী আধুনিক শিক্ষার মোকাবিলায় খ্রীষ্ট ধর্মের সনাতন বিশ্বাসসমূহ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা (যেমন, বাইবেলে বর্ণিত সবকিছুই যথার্থ)।"

Encyclopedia of Religion এর নিবন্ধার George M. Mardson-এর মতে :

> "Fundamentalism is a sub-species of evangelicalism. The term originated in America in 1920 and refers to evangelicals who consider it a chief christian duty to combat uncompromisingly modernist technology and certain secularizing culture trends." [Encyclopedia of Religion; Vol. 5 Article : Evangelical and Fundamental Christianity]

অর্থাৎ "মৌলবাদ হচ্ছে সুসমাচার প্রচার আন্দোলনের একটি উপগোষ্ঠী। এ শব্দটি আমেরিকায় ১৯২০ সালে উদ্ভূত হয়। এ শব্দ দ্বারা ঐ সমস্ত সুসমাচার প্রচারক গোষ্ঠীদের বুঝানো হয় যারা আধুনিকতাবাদী ধর্মতত্ত্বের এবং কতিপয় নির্দিষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সাংস্কৃতিক ধারার আপোষহীন মোকাবিলাকে প্রধান খৃষ্টান ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করে থাকে।"

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে ইহুদী-খৃষ্ট চক্র (Fundamentalism) নামের তাদের একটি বহুল প্রচলিত পরিভাষাকে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি আরোপ করেছে। এই আরোপের পিছনে রয়েছে এক গভীর ষড়যন্ত্র। আর তা হচ্ছে, ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদেরকে 'মৌলবাদী' আখ্যা দিয়ে সুকৌশলে ইসলামের মূল আদর্শ থেকে মুসলমানদের বিচ্যুত করার মাধ্যমে তাদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামের প্রতিপক্ষে দাঁড় করানো এবং প্রতারণা, ভণ্ডামী ও আত্মহননের পথ বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করা। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ইসরাইল সম্ভবতঃ আধুনিক বিশ্বের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে কট্টর ও গোঁড়া ধর্মবাদী রাষ্ট্র। নিছক ধর্মীয় গোঁড়ামীর কারণে ইসরাইল রাষ্ট্রটি অর্ধ শতাব্দীকাল যাবৎ বিশ্ব বিবেকের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে এত নিষ্ঠুর বর্বরতা প্রদর্শন করেছে যার তুলনা সমসাময়িককালে দ্বিতীয়টি নেই। অথচ

যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্সসহ ইহুদী-খ্রীষ্টীয় পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের তথাকথিত নিরপেক্ষ (?) প্রচারমাধ্যম একটিবারও ইসরাইলকে মৌলবাদী রাষ্ট্র বলে অভিহিত করেনি বরং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ সর্বতোভাবে এই জঘন্য ইহুদী ধর্ম রাষ্ট্রটিকে নির্লজ্জ মদদ যুগিয়ে এসেছে। তাই বলা যায় আমেরিকা তথা পশ্চিমের টার্গেট মৌলবাদ নয় বরং তাদের মূল টার্গেট ইসলাম। মৌলবাদকে বস্তাবন্দী করে তারা ইসলামকে ডুবিয়ে মারতে চায়, যদিও তা কিছুতেই হবার নয়।

ইসলামের ক্ষেত্রে মৌলবাদ কথাটি একেবারেই প্রয়োগ অযোগ্য। কারণ, ইসলামে মৌল ও অমৌল, প্রকৃত ও কৃত্রিম, আধুনিক ও পুরাতন বলে কিছু নেই। ইসলামের যা কিছু বিশ্বাস, প্রস্তাবনা ও নির্দেশনা সবই মৌলিক, প্রকৃত ও আধুনিক। মৌলবাদ কথাটি ইসলামের ক্ষেত্রে অযৌক্তিক হবার কারণগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১. মৌলবাদ তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিকভাবে একটি খৃষ্টান ধর্মতাত্ত্বিক আন্দোলন। তারা নিজেরা নিজেদের মৌলবাদী বলতো। নিজেদের জন্য উদ্ভাবিত নামটি অকারণ ইসলামের সাথে জুড়ে দেয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

২. ইসলামের মূলভিত্তি ও নীতির প্রশ্নে মুসলমানদের মধ্যে কোন দ্বিমত বা বিতর্ক নেই। আল্লাহ, তার নবী (স) ও পবিত্র কিতাব আল কুরআনের প্রশ্নে ইসলামের কোন দল বা গোষ্ঠীর সামান্যতম ভিন্ন বক্তব্য নেই। সুতরাং এখানে আলাদা করে কারো মৌলবাদী হবার সুযোগ নেই।

৩. ইসলামের মূলনীতি ও দর্শনের সাথে আধুনিকতার কোন দ্বন্দ্ব অতীতে ছিল না, বর্তমানে নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে না। কারণ ইসলাম ইজতিহাদের দরজা চির অবারিত রেখেছে। এ কারণে ইসলামের জীবন দর্শন কিয়ামত পর্যন্ত আজকের মতই আধুনিক থাকবে। এখানে মৌলবাদী ও অমৌলবাদীর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে না।

৪. চার্চের সাথে বিজ্ঞানমনস্কতার অনিবার্য দ্বন্দ্ব খৃষ্টান জগৎকে বিভক্ত করেছে। ফলে বিজ্ঞানের উন্নতির কাছে পরাজিত ধর্মবিশ্বাসকে স্বাভাবিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য খৃষ্টান যাজকগণ মৌলবাদ নামক চোখ বন্ধ নীতি অনুসরণ করেছে। কিন্তু মুসলিমগণ এজন্য অহংকার করতে পারেন না যে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের সাথে ইসলামের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ বিজ্ঞান কখনও বলেছে সূর্য ঘোরে আবার কখনও বলেছে পৃথিবী ঘোরে। আবার এখন বলছে পৃথিবী সূর্যসহ সকল গ্রহ নক্ষত্র আপন কক্ষপথে ঘোরে। অথচ পবিত্র কুরআন দেড় হাজার বছর পূর্বে ঘোষণা করেছে "গ্রহ নক্ষত্র প্রত্যেকেই নির্ধারিত কক্ষপথে ঘুরছে" (সূরা ইয়াসীন)।

এইভাবে জিন থিওরী থেকে শুরু করে 'ব্লাক হোল' থিওরী পর্যন্ত বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কারই ইসলামের সকল দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে হঠাৎ করে পাশ্চাত্য বিশ শতকের শেষ ভাগে এসে প্রকৃত ইসলাম অনুসারীদের জন্য মৌলবাদ শব্দটি প্রয়োগ করে অনাহুত আক্রমণ শুরু করলো কেন? উত্তরটি খুব সহজ এবং পরিষ্কার। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পাশ্চাত্য তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ইসলামকে নির্ধারণ করেছে এবং সত্যি বলতে ইসলাম ফোবিয়ায় ভুগছে। বিশেষ করে ইরানে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোদ্ধারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এরপর একে একে আলজিরিয়া, সুদান, তুরস্ক ও মিশরে এমনকি সৌদী আরবের মত দেশে ইসলামের নব জাগরণ পাশ্চাত্যকে রীতিমত ভড়কে দেয়। ফিলিস্তিনের ইনতিফাদা যখন ইসরাইলের দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা রীতিমত থমকে দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য এবার বিশ্বব্যাপী তার যোগাযোগ ও প্রচার নেটওয়ার্কের সাহায্যে বিশেষ করে দেশে দেশে ইসলামী পুনর্জাগরণবাদীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ আনতে শুরু করে এবং বিশ্বময় "ইসলাম" ও "ইসলামী আন্দোলনকে" একটি আতংকের বস্তুতে পরিণত করতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টায় নতুন মাত্রা যোগ হয় যখন খোদ যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিশাল বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ওমর আঃ রহমান নামের এক নির্বাসিত অন্ধ ইসলামী নেতাকে যুক্তরাষ্ট্র বোমা ফাটানোর দায়ে অভিযুক্ত করে এবং বিচারের প্রহসন চালায়। ১৯৮৬ সালে ফিলাডেলফিয়াস্থ পররাষ্ট্রনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও ত্রৈমাসিক জার্নাল, 'অবরিম' এর সম্পাদক মিঃ পাইনস কর্তৃক লিখিত এক প্রবন্ধে ইসলামী মৌলবাদকে পাশ্চাত্যের জন্য সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়েও বিপদজনক বলে উল্লেখ করা হয়। এমনিভাবে বহু পাশ্চাত্য লেখক তাদের লেখায় ইসলামী মৌলবাদের ভূত দেখতে শুরু করেন। খোদ যুক্তরাষ্ট্র দেশে দেশে পরিচালিত ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে এবং এসব আন্দোলনকে সাবোটাজ করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের কাছে বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলন হার মেনেছে তা বলবো না, তবে কখনো কখনো কোন কোন দেশের ইসলামী আন্দোলনের একাংশ যে কিছুটা 'আছাড় খেয়ে পড়েছেন' বা পরিস্থিতির শিকার হয়ে বাড়াবাড়ির দিকে যেতে চেয়েছে বলে মনে হয়েছে এবং ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন সহিষ্ণুতা, ভারসাম্য ও পরিমিতিবোধ কখনো কখনো লংঘিত হয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ইসলামী আন্দোলনে 'মিলিট্যান্স' অবশ্যই দরকার। কিন্তু 'ওভার মিলিট্যান্স' ভালো নয়। আন্দোলনে পেশীশক্তির অপপ্রয়োগ জনরোষের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম কৌশল হলো ইসলামী আন্দোলনকে violence এ যাওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি করা অর্থাৎ এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে অনেকটা বাধ্য হয়েই ইসলামী আন্দোলনের 'মিলিট্যান্ট' অংশ শক্তি প্রদর্শনের পথ বেছে নেয়।

বাংলাদেশে মৌলবাদের সফল আমদানীকারক সম্ভবতঃ সাপ্তাহিক বিচিত্রা। পরবর্তীতে এর সাথে যোগ দেয় দৈনিক আজকের কাগজ, জনকণ্ঠসহ বেশ কিছু পত্রপত্রিকা ও এর সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ। এক শ্রেণীর বাম আধাবাম বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক যারা কখনো লাল সাম্রাজ্যবাদ আবার কখনো শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের দালালী করতে অভ্যস্ত তারাই বাংলাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণকে ঠেকানোর জন্য "মৌলবাদের" গালি প্রবর্তন করে। এক সময় মূলতঃ জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরকেই মৌলবাদী বলে কটাক্ষ করা হতো; কিন্তু বাবরী লংমার্চ এর পর থেকে বাম আঁতেলরা খেলাফত মজলিশ, ইসলামী শাসনতন্ত্র ইত্যাদি সংগঠনকেও এখন মৌলবাদী বলে গালি দেয়। বাংলাদেশে এখন ইসলামী পুনর্জাগরণের সপক্ষ শক্তিমাত্রই মৌলবাদী নামে অভিহিত হচ্ছেন।

বাংলাদেশে এ যাবৎ ইসলামী শক্তিকে মৌলবাদী আখ্যা দেয়ায় জামায়াতে ইসলামীকে অন্যান্য ইসলামী শক্তি থেকে আলাদা করার কৌশলটি অবশ্য ভেস্তে যেতে বসেছে। এখন ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সকল শক্তিই অনুভব করতে শুরু করেছে যে, ছোটখাটো মতপার্থক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে অপশক্তির মোকাবিলা করা না হলে ইসলামী শক্তির পিঠ বাঁচানোই কঠিন হয়ে পড়বে।

সাম্প্রতিককালে শিখা চিরন্তন নির্বাপন ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের দাবিতে সারা দেশ জুড়ে সকল ইসলামী শক্তি যেভাবে স্ব স্ব মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিন্ন আন্দোলন পরিচালনা করছেন তা মহা ঐক্যের পথে প্রথম ধাপ। একইভাবে দেশের ৪৩টি জেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পরিচালিত দীনি ও সমাজ উন্নয়নমূলক তৎপরতা বন্ধের সরকারের আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশের সকল ইসলামী শক্তি সম্মিলিতভাবে যে আন্দোলন গড়ে তোলে তার প্রেক্ষিতে সরকার অতি সম্প্রতি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাড়ে তিনশোর মত কর্মকর্তা কর্মচারীকে রাজস্ব খাতে ন্যস্ত করেছেন। এর থেকে সরকারের ভেতরে ও বাইরে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের এই শিক্ষা নিতে হবে যে, এদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুণ্নকারী কোন সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা কখনোই খুব সহজ হবে না। একইভাবে দেশের সকল ইসলামী শক্তির জন্যে এই ঘটনায় শিক্ষা রয়েছে যে, সম্মিলিতভাবে এগিয়ে গেলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের সৈনিকদের বিজয় অর্জিত হবে।

সবশেষে যে কথাটি খুবই বলা প্রয়োজন তাহলো, ছেলের নাম রাখার অধিকার ও দায়িত্ব প্রতিবেশীর চেয়ে বাবা মায়েরই বেশী। পবিত্র কুরআনে মুসলমান জাতির পিতা হিসেবে হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং এও জানিয়ে দেয়া

হয়েছে যে, জাতির পিতা তাঁর সন্তানদের নাম রেখেছেন মুসলমান। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

> "ইব্রাহিম তোমাদের জাতির পিতা এবং
> তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান।"

সুতরাং মুসলমান নামহীন গোত্রহীন কোন জাতি নয় যে, পাশ্চাত্যকে তার নাম পরিচয় ঠিক করে দিতে হবে। তথাপি বিকৃতির দুরভিসন্ধি নিয়ে পাশ্চাত্য এবং তাদের এদেশীয় মিত্ররা ইসলামী আন্দোলনের জন্য মৌলবাদ শব্দটি গালির মত করে উচ্চারণ করলে শব্দ হিসেবে এটি খুব খারাপ শুনায় না। অমৌলবাদী হওয়ার থেকে মৌলবাদী হতে পারা নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। প্রকৃত মুসলমান মাত্রই শিকড় সন্ধানী। তাই মৌলবাদী পরিচয়ে তার আতংকিত হবার পরিবর্তে অহংকার বোধ করাই উচিৎ। এটা করতে পারলে পাশ্চাত্য ও তাদের শেকড়হীন সেবাদাসরা ভীষণভাবে হতাশ হবে এবং আরোপিত গ্যানিবোধ থেকে বিশ্ব মুসলিম মুক্তি পাবে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

আলোচ্য তিনটি পরিভাষার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই সম্ভবতঃ সবচেয়ে প্রতারক (deceiving) শব্দ। এই শব্দটি কখন কি রূপ পরিগ্রহ করে তা বলা মুশকিল। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতার মধ্যে কার্যক্ষেত্রে পার্থক্য করা খুবই দুরূহ বলা যায় অসম্ভব। সংশয়বাদী ও নাস্তিকের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য সত্ত্বেও কাজের বেলায় উভয়েরই আচরণ অভিন্ন হতে বাধ্য। কারণ, এক আল্লাহকে কেউ যখন বিশ্বাস বা স্বীকার করে না তখন তার ইহজাগতিক কর্মকাণ্ডে আল্লাহ কোন বিবেচ্য বিষয় হতে দাঁড়ান না। যেমন একজন ঈমানদার ব্যক্তি অবশ্যই নামায রোযা পালনসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে যা একজন নাস্তিক কখনোই করেন না। কিন্তু একজন সংশয়বাদী কি করেন? আল্লাহর আদেশ মানা ও না মানার মধ্যে কোন তৃতীয় বিকল্প কি সত্যিই আছে? নেই। অর্থাৎ একজন সংশয়বাদীও নাস্তিকের মতই আল্লাহর বিধান অমান্য করেন। ধর্মনিরপেক্ষতার বেলায়ও একই এনালজি কাজ করে। একজন ধর্মভীরু ব্যক্তি ধর্মাচরণ করে থাকেন যা কোন ধর্মহীন ব্যক্তি করেন না। কিন্তু একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিও কার্যতঃ ধর্মহীন ব্যক্তির মতই ধর্মাচরণ থেকে বিরত থাকেন।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন তবে যে আমাদের দেশে ধর্মহীনতার দাবীদারদের একটি অংশকে মসজিদে দেখা যায়, তারা ভোটের স্বার্থে চোখে পড়ার মত আরো কিছু ধর্মাচরণ করে থাকেন এর ব্যাখ্যা কি? ব্যাখ্যা খুবই সহজ ও পরিষ্কার। এরা

ব্যক্তিগতভাবে ধর্মভীরু কিন্তু রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ। অনেকটা সেই ব্যক্তির মত যে ব্যক্তিগতভাবে সৎ কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে ভয়ানক অসৎ। হাস্যকর মনে হলেও এমন ব্যক্তি আমাদের চারপাশে প্রচুর আছে। অনেকে চুরি করে দান করে; সবচেয়ে হিংস্র ও নিষ্ঠুর ব্যক্তিও কোথাও না কোথাও তার স্নেহ মমতার প্রকাশ ঘটায়; একজন লোক ব্যক্তিগতভাবে খুব দানশীল কিন্তু অফিসে তার ঘুষের বদনাম, একজন লোক নামাজে ফাঁকি দেয় না। কিন্তু অফিসে ফাঁকি দেয়। এসবই দুঃখজনক স্ববিরোধিতা এবং এমনি হাজারো স্ববিরোধিতা প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজ ও সভ্যতাকে ক্রমাগত নীচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

রাজনৈতিকভাবে যারা ধর্মনিরপেক্ষ তারা ধর্মকে মনে করেন এক শ্বেত শুভ্র বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় যা রাজনীতির ময়দানে টেনে নিয়ে আসলে কালিমালিপ্ত হবে। এদের বিবেচনায় ধর্ম রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিশুদ্ধ করার পরিবর্তে নিজেই সমাজ ও রাজনীতির পঙ্কিলতায় সমর্পিত হয়। পক্ষান্তরে যাদের অবস্থান ধর্মনিরপেক্ষতার বিপক্ষে তারা ধর্মকে নিক্রিয় বস্ত্রখণ্ডের পরিবর্তে সক্রিয় ডিটারজেন্টের সাথে তুলনা করেন যা তার অন্তর্গত ক্ষমতা দিয়ে রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে শুভ্র ও পবিত্র করবে। ধর্ম যদি অবশ্য পালনীয় আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ-সাবধানতার সমষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তার তুলনা শুচী শুভ্র বস্ত্রখণ্ডের পরিবর্তে পরিচ্ছন্নতার ক্ষমতাসম্পন্ন ডিটারজেন্ট বা সাবানের সাথে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং রাজনীতিতে ধর্ম টেনে না আনার দাবি নেহায়েত অজ্ঞতাপ্রসূত এবং একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে ধর্মের প্রবেশ নিষিদ্ধকরণও এই অযৌক্তিক প্রস্তাবনা সমাজ ও সভ্যতার জন্য খুবই ক্ষতিকর। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তার ধর্মাচরণের কারণে ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও ন্যায়বান। এই ব্যক্তি তার রাজনৈতিক জীবনে ধর্মাচরণ না করার অর্থ হচ্ছে তিনি এখন জালভোট দিতে পারবেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি এমনকি খুন পর্যন্ত করতে পারবেন, মিথ্যা কথা বলতে পারবেন, অন্যের কুৎসা রটাতে পারবেন, গুজব ছড়াতে পারবেন এক কথায় যাবতীয় অন্যায় করতে তিনি এখন লাইসেন্সপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে, রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্মের বিধিনিষেধ মেনে চললে তিনি এইসব অপকর্ম করতে পারতেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজনীতিতে ধর্মকে প্রবেশাধিকার দিতে যারা কুণ্ঠিত তারা প্রকৃতপক্ষে এক বল্গাহীন রাজনৈতিক অংগনের প্রত্যাশা করে থাকেন যা অসুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক।

আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে যারা শুধু রাষ্ট্রীয় আইন বিধান তৈরির ক্ষেত্রে ধর্মের নিঃসম্পর্কতার কথা বলেন তাদের দাবীও মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। উত্তরাধিকার আইন ইসলামের একটি অলংঘনীয় আইন। এখন সরকার যদি এই আইনে কোন পরিবর্তন করেন বা করতে চান তাহলে একজন ঈমানদার মুসলমান তা

রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। কারণ, ধর্মবিরোধী রাষ্ট্রীয় আইন এক্ষেত্রে তাকে ধর্ম পালনে বাধা দেবে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আরেকটি যুক্তি হলো, একটি দেশে নানা ধর্মের লোক থাকে। রাষ্ট্র যদি একটি ধর্মের ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট (biased) হয় তাহলে অন্য ধর্মের প্রতি অবিচার করা হবে। প্রশ্নটি ধর্ম থেকে সরিয়ে অন্য কোন বিষয়ে নিবদ্ধ করা যাক। একটি দেশে নানা ভাষাভাষী লোক থাকে। পৃথিবীর সকল দেশেই সাধারণতঃ সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষায় রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন। আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তিও ছিল তাই। এক্ষেত্রে কি কখনো এই অভিযোগ ওঠে যে সংখ্যালঘুর অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে?

সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হয় তখন যখন একশ্রেণীর পণ্ডিতমূর্খ কিংবা হঠকারী রাজনীতিক ধর্মের বাণী দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণের ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত বাণীটি হচ্ছে পবিত্র কুরআনের সূরা কাফিরূনের শেষ আয়াত "লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন" অর্থাৎ তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য এবং আমার ধর্ম আমার জন্য। এই বাক্যটি ধর্মের ব্যাপারে আপোষকামিতার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত। ধর্ম সম্পর্কে যারা সামান্য জ্ঞান রাখেন তারাও জানেন যে, মক্কার কাফিরগণ প্রিয় নবী (স)-এর নিকট যখন পবিত্র কাবা গৃহে সকল ধর্মের সহাবস্থানের (আধুনিক পরিভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতা) প্রস্তাব পেশ করে তখন মহান আল্লাহ পাক এই পবিত্র বাণীর মাধ্যমে চিরতরে ধর্মনিরপেক্ষতার কবর রচনা করেন। সুতরাং যেসকল রাজনীতিক প্রতারণামূলকভাবে পবিত্র কুরআনের বাণীর জঘন্য অপপ্রয়োগ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে ম্লান করে তাকে আর দশটি ধর্মের কাতারে এনে দাঁড় করাতে চান তারা ধর্মনিরপেক্ষতাও বুঝেন না, ইসলামও বুঝেন না।

পবিত্র কুরআনের আরো একটি আয়াত এ প্রসঙ্গে প্রায়শঃ উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে। আয়াতটি হলো "লা ইকরাহা ফিদ্দীন" অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। এ আয়াতটি অন্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে ইসলামের সহিষ্ণুতার প্রতীক। এথেকে ধর্মনিরপেক্ষতা আবিষ্কারের সুযোগ নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো, কোন ধর্ম কখনো ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ওকালতি করতে পারে না কারণ এমনটি করার অর্থ হচ্ছে ধর্মের নিজের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে- এত কষ্ট করে যারা কুরআন হাদীস থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বপক্ষে দলিল পেশ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন তাদের রোগাপীড়িত হৃদয়পটে কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীসমূহ একবারও উঁকি দেয়না। যেমন ঃ

১. "ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ।" অর্থাৎ (এই জগতে) হুকুম দানের অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।

২. "আলা লাহুল খালকু ওয়াল আমরু" অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর, অতএব হুকুমও চলবে কেবলমাত্র তাঁরই।

৩. "যারা (এই পৃথিবীতে) আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারা কাফির।"

এমনি অসংখ্য আয়াতে কারীমায় সমগ্র বিশ্বজগতে মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের যে দৃপ্ত ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং পৃথিবীতে জীবন দিয়ে হলেও আল্লাহর বিধান কায়েম করার যে অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলি আমাদের তথাকথিত বর্ণচোরা ও জ্ঞানপাপী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের চোখে পড়ে না।

বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে রাষ্ট্র ও রাজনীতি বাস্তবে কতখানি ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে পারে?

সত্য কথা হচ্ছে বাংলাদেশের মত একটি ধর্মলালিত এবং বিশেষভাবে মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ইচ্ছা করলেও ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে পারেনা। এই সহজ সত্য কথাটি আমাদের শাসক রাজনীতিবিদগণ যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবেন দেশ ও জাতির জন্য ততই মঙ্গল। কিছু উদাহরণ দেয়া যাক ঃ

হজ্জ সম্পাদন ঃ বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম দেশ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার মুসলিম হজ্জ্ব পালন করেন। এযাবৎ সরকারী ব্যবস্থাপনায় ব্যালটি এবং বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় নন ব্যালটি হিসেবে হাজীগণ হজ্জ পালন করে থাকেন। এ কাজটি নিঃসন্দেহে একটি ধর্মীয় কাজে রাষ্ট্রযন্ত্রের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। সরকার যে হজ্জ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন তা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই অন্যায় বা অপ্রয়োজনীয়? কারণ, আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের মত দেশে এ ধরনের হজ্জ, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের মত একটি দেশে সরকার এ কাজটি বর্জন করে তার জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারবেন কি?

একইভাবে জাতীয় ঈদগাহ, জাতীয় মসজিদ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাজার, ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বহু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সরকার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে থাকেন। দেশের অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির ও গীর্জায় সরকার নিয়মিত সাহায্য ও অনুদান প্রদান করে থাকেন। এসবই তো ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রীয় পোষকতা। ধর্মনিরপেক্ষ থাকার স্বার্থে সরকার কি এসব পরিচালনা ত্যাগ করবেন? আর তেমনটি করলে বাংলাদেশের মত দেশে সরকার কি জনরোষ থেকে বাঁচতে পারবেন?

বিভিন্ন সড়ক, ভবন ইত্যাদি উদ্বোধন বা ফলক উন্মোচনের সময় এদেশে প্রার্থনার একটি রীতি চালু আছে। মুসলিম প্রধান দেশ হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই এখানে সকলেই

মুনাজাত করে থাকেন। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার আওয়ামী লীগ সরকারও এ ব্যবস্থা তুলে দিতে উদ্যোগী হননি। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কি চান যে, অতঃপর ধর্মীয় রীতির মুনাজাত ছাড়াই সকল উদ্বোধন ও উন্মোচন হোক?

যদিও সরকার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের রীতি চালু করেছেন কিন্তু পার্লামেন্টে এখন পর্যন্ত প্রতিদিন অনুষ্ঠান শুরুর আগে কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা হয়ে থাকে। পারবেন কি সরকার এ পদ্ধতি পরিবর্তন করতে? প্রতিদিন টিভি অনুষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে পর্দায় ভেসে ওঠে আরবীতে লেখা 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম'। এখন কি ধর্মনিরপেক্ষতার বদৌলতে বিসমিল্লাহর নীচে অন্যসব ধর্মগ্রন্থের উদ্বোধন বাক্য সংযুক্ত করতে হবে?

কেয়ারটেকার সরকার প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষ সাজতে গিয়ে বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম এর বাংলা অনুবাদ করে এক অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের সূচনা করেছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরও এধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। জননিন্দার কাছে নতি স্বীকার করে অবশেষে আওয়ামী লীগ বিসমিল্লাহর অনুবাদ ত্যাগ করেছে। এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রীর প্যাডেও শোভা পাচ্ছে আরবী হরফে লেখা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'।

এদেশের বর্ষীয়ান বাম রাজনীতিক অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ তার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে অবশেষে তার কর্মীদের যে তপ্ত বাক্যটি মুখস্থ করিয়েছিলেন তা ছিলো, "ধর্ম কর্ম সমাজতন্ত্র: মোজাফফরের মূলমন্ত্র"। এমনিভাবে ধর্মহীনতা তথা ধর্মনিরপেক্ষতার পরাজয়ের অনেক কাহিনী ইতিহাস হয়ে আছে শত আওলিয়ার পুণ্যস্মৃতির এই বাংলাদেশে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা আসলে কতটা ধর্মনিরপেক্ষ?

বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অংগনে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ান তারা আচরণে তো নয়-ই এমনকি চিন্তায় চেতনায়ও যে মোটেই ধর্মনিরপেক্ষ নন তার প্রমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। তারা যদি মনে প্রাণে, ধর্মনিরপেক্ষ হতেন তবে নিজেরা তো ধর্মের বিপক্ষে কিছু লিখতেনই না বরং অন্য কেউ ধর্ম ও ধর্মীয় নেতাদের কটাক্ষ করে কিছু লিখলে তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত তার প্রতিবাদ জানাতেন। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য হচ্ছে এখানে যারাই ধর্মনিরপেক্ষ তারাই ধর্মহীনই শুধু নয় বরং ধর্মবিরোধী। এরা প্রায়শঃ ধর্মের বিরুদ্ধে লিখে থাকেন যা তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সুস্পষ্ট লংঘন। ১৯৭৪ সালে কুখ্যাত দাউদ হায়দার যখন প্রিয়নবী (স)-এর প্রতি বিষোদগার করে কবিতা লিখেছিল তখন এইসব ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তার

ন্যূনতম প্রতিবাদও করেনি। পরবর্তীতে কুখ্যাত আলাউদ্দিন, তসলিমা নাসরিন, হুমায়ুন আজাদ, আহমদ শরীফ গং্রা ইসলাম ও তার নবী (স)-এর কটাক্ষমূলক রচনা প্রকাশ করে তখনও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু জনতার রুদ্ররোষ যখন বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত উপচে পড়ে তখন এইসব বর্ণচোরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বাক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের নামে জনতার অভিব্যক্তির প্রতিপক্ষে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার সবচেয়ে বড় প্রবক্তা আওয়ামী লীগ। এবার দেখা যাক আওয়ামী লীগ সত্যি সত্যিই কতটা ধর্মনিরপেক্ষ। নেতা-কর্মীদের ব্যক্তিগত আচরণ, দলীয় নীতি কৌশল, দলের ঐতিহাসিক ভূমিকা ইত্যাদি নানা দিক থেকেই এই মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত আচার আচরণ

আওয়ামী লীগ সভানেত্রীসহ দলের প্রথম কাতারের বেশ ক'জন নেতা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মবিশ্বাসীই শুধু নন বরং তারা নিয়মিত ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালনেও অভ্যস্ত। এরা নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, কেউ একবার কেউ বারবার হজ্জ করেন। কেউ কেউ জাকাতও দেন। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার নেতাদের মৃত্যুর পরে জানাজাও দেয়া হয়। দলের কোন কোন সিনিয়র নেতা নিয়মিতভাবে টুপি পরেন এবং দাড়ি রাখতে অভ্যস্ত। দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনাও নির্বাচনের আগে হজ্জ শেষে মাথায় পট্টি বেঁধে এবং হাতে তসবিহ নিয়ে দেশবাসীকে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিলেন।

ঐতিহাসিক ভূমিকা

১. পাকিস্তান আমলে বিশেষ করে '৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনের আগের প্রতিটি জনসভায় মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান বলতেন, "আমরাও মুসলমান", পার্লামেন্টে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন আমরা পাস করবোনা ইত্যাদি।"

২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষিত যে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তার অন্যতম শর্ত ছিলো এই যে, ক্ষমতাগ্রহণকারী দল পাকিস্তানে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র তৈরি করবে। কোন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দলের পক্ষে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অংগীকার করা অসম্ভব।

৩. ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের জেল থেকে বেরিয়ে এসেই বাংলাদেশের স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বাংলাদেশকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেন। একটি রাষ্ট্রকে মুসলিম রাষ্ট্রের মর্যাদা ও ঘোষণা দানকারী ব্যক্তিকে যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলে দাবী করেন তারা হয় ধর্মনিরপেক্ষতাই বুঝেন না অথবা ব্লাকমেইল করার চেষ্টা করেন, যা খুবই অন্যায়।

৪. আওয়ামী লীগের শাসনামলেই বাংলাদেশ ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করে।

৫. ১৯৭২ সালে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান করেন।

৬. দেশে ধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

৭. শেখ মুজিব স্বাধীনতাত্তোর ভেঙ্গে পড়া মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করেন।

রাজনৈতিক কৌশল ও প্রচার প্রপাগান্ডা

১. পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগ বারবার তাদের দৃষ্টিতে দেশের সর্ববৃহৎ মৌলবাদী দল জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোট গঠন করে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'ডাক' (DAC) পি.ডি.এম. (PDM) ইত্যাদি। উল্লেখ্য জামায়াতের বর্তমান আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম 'ডাক' জোটের সেক্রেটারী ছিলেন।

২. স্বৈরাচারী এরশাদ হটাও আন্দোলনে আওয়ামী লীগ তাদের ভাষায় মৌলবাদী দল জামায়াতে ইসলামী ও আধা মৌলবাদী বিএনপি'র সাথে মিলে অভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে আন্দোলন করে সফল হয়।

৩. এরশাদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ঘাদানিকের তথাকথিত গণআদালত কর্তৃক ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের কাছে দোয়া প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন।

৪. কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠা ও বিএনপি সরকার উৎখাতের আন্দোলনে আওয়ামী লীগ যেভাবে সকল আবেগ ও উত্তাপের উর্ধ্বে উঠে এবং দলের ভেতরের একাংশের আপত্তির পাশাপাশি বাম আধাবাম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুহৃদদের রিজার্ভেশন উপেক্ষা করে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাথে

একত্রে আন্দোলন করে লাভবান হয়েছে এবং লাভালাভের রাজনীতি পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের ঘরে বাইরে যেভাবে নন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছে তারপরও আওয়ামী লীগকে ধর্মনিরপেক্ষ দল বলে ভুল করার কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

৫. আওয়ামী লীগ বিগত সাধারণ নির্বাচনে ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার পাশাপাশি নানাভাবে ধর্মাচরণের কৌশল অবলম্বন করে এ দেশের ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীকে কাছে টানার বিরল নীতি অবলম্বন করে। তারা একাধারে হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কাছে টানার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। যেমনঃ

ক. সারাদেশে পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদির শুরুতে "আল্লাহ সর্বশক্তিমান" কথাটি উৎকীর্ণ করে আওয়ামীলীগ প্রকাশ্যে দলীয়ভাবে তার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ক্ষুণ্ন করে।

খ. শেখ হাসিনা মসজিদ থেকে মৌলবাদীদের প্রভাব মুছে ফেলতে এবং তার দলের লোকদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির স্বার্থে দলীয় কর্মীদের বেশী বেশী মসজিদে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

গ. দলের সভাসমূহে নামাজের বিরতি একটি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়।

ঘ. দলীয় সভানেত্রী হজ্জ পালন শেষে ইসলামী পোশাকে (মাথায় পট্টিসহ) আবৃত হয়ে মুসলিম জনগণের প্রশংসা কুড়ান।

ঙ. সারাদেশে মিছিলে মিটিংয়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ: নৌকার মালিক তুই আল্লাহ" শ্লোগান দেয়া হতে থাকে।

চ. হিন্দুদের ভোট শতকরা একশত ভাগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী হুট করে তাড়াতাড়ি শত্রু সম্পত্তি আইনের মত একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলে। অথচ ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ এ আইন বাতিলের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায়নি কারণ আওয়ামী লীগ ভালো করেই জানে যে শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল হলে আওয়ামী লীগের নিজের ঘরেই যুদ্ধ শুরু হবে।

এতকিছু করার পরও যদি আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ন থেকে থাকে তবে বলতেই হবে যে আসলে ধর্মনিরপেক্ষতায়ও ভেজাল আছে।

এখানে বিএনপি বা জাতীয় পার্টির ধর্মমুখী আচরণ এবং নির্বাচনী কৌশল হিসাবে ধর্মের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করার কারণ এ দুটি বাস্তবে যাই করুক মুখে অন্ততঃ নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতার এজেন্ট হিসাবে দাবি করেনা।

সাম্প্রদায়িকতা

সাম্প্রদায়িকতার সাথে ইসলামের সম্পর্ক কেবলই দ্বন্দ্ব ও দূরত্বের। ইসলাম কেবল মুসলমানের ধর্ম নয় বরং ইসলাম সমগ্র মানবতার ধর্ম। পবিত্র কুরআনে যেমন মুসলমানদের সম্বোধন করে বক্তব্য দেয়া হয়েছে তেমনি সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করেও আহ্বান রাখা হয়েছে। অতঃপর অবিশ্বাসী, আহলি কিতাব ও মুশরিকদের আলাদা আলাদা সম্বোধনের মাধ্যমে বাণী প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেশীর অধিকার বিষয়ে ইসলাম অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য রেখেছে এবং সেক্ষেত্রে মুসলমান অমুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এমনকি কোরবানীর গোশত থেকে পর্যন্ত অমুসলিম প্রতিবেশীর জন্য হাদিয়া পাঠাবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিধর্মীদের দেবতাদের গালি দিতে নিষেধ করেছেন। সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য অমুসলিমদের জান ও মালকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে মুসলমানগণ চিরদিন তাদের অমুসলিম প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছেন।

বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহাসিকভাবেই আশ্চর্যরকম অসাম্প্রদায়িক। এ দাবি কেবলমাত্র ধার্মিকদের নয় বরং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদেরও। যেমনটি বলেছেন সাপ্তাহিক বিক্রম পত্রিকার সৈয়দ মবনুকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বিখ্যাত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সাংবাদিক ও কলামিস্ট আব্দুল গাফফার চৌধুরী।

"বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নেই। সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে শাসক শক্তির ভিতরে। ওরা নিজেদের গদি রক্ষার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করে। এছাড়া বাংলাদেশে কোন সামাজিক সাম্প্রদায়িকতা নেই।"

গাফফার চৌধুরীর এই বক্তব্যের সাথে আমার কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সাম্প্রদায়িকতা যদি শাসক শক্তির স্বার্থের আবিষ্কার এবং তাদের গদি রক্ষার হাতিয়ার হয়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ নির্মাণের জন্য কর্মরত সংগঠন ও সংস্থাসমূহকে- যারা কখনোই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেনি সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসেবে অপবাদ দেয়ার আর সুযোগ থাকে কি?

একটি বিষয় অবশ্য কিছুতেই বোধগম্য নয়। তাহলো এদিকে সকলেই স্বীকার করেন যে, বিগত অর্ধশতাব্দিকাল যাবৎ এবং তারও আগে থেকে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দাবি হচ্ছে বাংলাদেশের ইসলামী শক্তি মাত্রই সাম্প্রদায়িক। এত সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশে বিরাজ ও সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও শতাব্দীকাল ধরে দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তি বজায় থাকাটা খুবই অসম্ভব একটি ব্যাপার। এর থেকে বরং একথাই প্রমাণিত হয় যে, সাম্প্রদায়িক শক্তি বলে যাদেরকে প্রমাণ করার অন্যায় চেষ্টা করা হয় তারা আসলেই সাম্প্রদায়িক নয়।

এরপরও একথা সত্য যে, দেশের সব এলাকায় সব দিনগুলো হয়তো ভালো যায়নি। তবে সেজন্য প্রথমতঃ দায়ী দেশের সরকার, দ্বিতীয়তঃ দায়ী এদেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতা ও কর্মী যারা সাম্প্রদায়িকতার দিবাস্বপ্ন দেখেন। এ জন্য দায়ী তৃতীয় পক্ষ অবশ্যই এদেশের উচ্চ বর্ণের বুর্জোয়া জমিদার হিন্দু শক্তি। হিন্দু জমিদারদের শোষণ, বঞ্চনা ও অমানুষিক নির্যাতন এদেশের চিরায়ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেয়ালে চিড় ধরার জন্য যে অনেকখানি দায়ী তা অনস্বীকার্য। কিছু উদাহরণ দেয়া যাক ঃ

ভারত ভাগের (১৯৪৭) সময় ভারতে হিন্দু ছিল ৩০ কোটি আর মুসলমান ১০ কোটি। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা সংখ্যালঘু মুসলমানদের সবদিক থেকেই বঞ্চিত করতো। বর্তমানের তরুণরা অবশ্য একথা বিশ্বাস করে না; তাদের ধারণা এসব মুসলমান মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকদের রটনা। এটা যে রটনা নয়, সত্যি ঘটনা, তা প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের স্বীকারোক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ লিখেছেন ঃ

"কাজেই বাংলার হিন্দু কিন্তু কেবল হিন্দুর কল্যাণেই করল আত্মনিয়োগ, স্কুল-কলেজ, পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি, সাহিত্য-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাস্ত্র-শোধন, সমাজ-সংস্কার, দান-ধর্ম, চাকরী-মজুরী, এমনকি সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনও করত কেবল হিন্দুর জন্য ও হিন্দুর স্বার্থে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান যে গাঁয়ে-গঞ্জে কেবল পাশাপাশি বাস করেন না, অভিন্ন হাটে-বাটে, মাঠে-ঘাটে, বেচা-কেনায়, লেন-দেন, সহযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে অবিচ্ছেদ্য এ সত্য। এ সময়কার হিন্দুর ভাব, চিন্তা-কর্মে ও আচরণে অনুপস্থিত...।

আহমদ শরীফ ঃ প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ঃ ঢাকা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৮৬, পৃঃ ৪৪।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিল্পপতি ড. মাযহারুল ইসলামও মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সমাজের বৈরী মনোভাবের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

"মুসলমানদের পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে ঠেলে দিয়েছিল শাসকগোষ্ঠির বিভেদ নীতি এবং মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সমাজের বৈরী মনোভাব। নবজাগ্রত হিন্দু সমাজ মুসলমানকে অপাংক্তেয় ভেবে দূরে সরিয়ে রেখে ইংরেজ প্রভুদের নিকট থেকে সমগ্র সুযোগ-সুবিধা বিচ্ছিন্নভাবে শুধু নিজেরাই ভোগ ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং মুসলিম সমাজ সম্পর্কিত অচলায়তন সৃষ্টি করে আত্মপরায়ণ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, এই বলে শুধু তাদেরকে একাই দায়ী করা যায় না। এই প্রক্রিয়ায়

হিন্দু সমাজের অবদান কম নয়।"... ড. মাযহারুল ইসলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃঃ ৪৮।

হিন্দু নেতারা একান্ত জনসভায় মুসলমানদের সসম্মানে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যাবার হুকুম জারি করতেন। সেকালে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য তুলে ধরা হলো ঃ "মালব্য জী এবং লালাজীর সমস্ত বাকচাতুরীর পুরু আবরণ ভেদ করিয়া প্রধানতম শিষ্যগণের মুখে সংগঠনের প্রকৃতস্বরূপ যেরূপভাবে ফুটিয়ে উঠিতেছে, তাহা অতি ভয়াবহ। কিছুদিন পূর্বে লালা লাজপত রায়ের অন্যতম সহযোগী লালা হরদেয় লাল প্রকাশ্যভাবেই মুসলমানদিগকে হয় হিন্দু ধর্মগ্রহণ অথবা সসম্মানে জীবন লইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রকাশ্য হুকুম জারি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রধানত সহযোগী স্বামী সত্যদেব আরও স্পষ্ট ভাষায় শুদ্ধি ও সংগঠনের উদ্দেশ্যে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

শুদ্ধি ও সংগঠনের স্বরূপ ঃ সম্পাদক ইসলাম দর্শন, অগ্রহায়ণ ১৩৩২।

মোস্তফা নূরুল ইসলাম ঃ সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত ঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭। পৃষ্ঠা ঃ ২৮১।

মুসলমানদেরকে হয় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ অথবা সসম্মানে জীবন নিয়ে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করার কথা হিন্দু নেতৃবৃন্দ সরবে ঘোষণা করতেন। হিন্দু ৩০ কোটি, মুসলমান ১০ কোটি, সংখ্যাধিক্যের জোরে উৎখাত করার চিন্তা সবাইকে পেয়ে বসেছিল। বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাধিক্য। মোঘল আমলের ঐতিহ্যবাহি ঢাকার জনসভায় পর্যন্ত এই নির্মূল করার বা বিতাড়নের কথা ঘোষণা করতে হিন্দু নেতৃবৃন্দ দ্বিধাবোধ করতেন না।

কাচারির বিপরীত দিকে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের বিরাট প্রাঙ্গণ। সেখানে বিশাল চন্দ্রাতপের নিচে নিখিল বঙ্গীয় অথবা নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সম্মেলন হচ্ছে। খুব সম্ভব ১৯২৮ সালের অথবা ১৯২৯ সালের এন ধিক্কার কথা, ঠিক মনে করতে পারছিনা। সম্মেলন উপলক্ষে শহরে জোর প্রচারণা চলছিল।

... এক বন্ধুর কাছ থেকে ধুতি জোগাড় করলাম। বিকেলে দু'জনে গেলাম সভায়। ড. মুন্ডেহ এবং এন সি কেলেকার উভয়েই উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী বক্তৃতা দিলেন। দু'জনের একজন বলেছিলেন যে, মুসলমানরা যদি এদেশে থাকতে চায় তাহলে হিন্দু জাতির সঙ্গে লীন হয়ে থাকতে হবে; নতুবা সাতশ' বছর বসবাসের পর মুসলমানরা স্পেন হতে যেভাবে বিতাড়িত হয়েছিল আমরাও তাদেরকে সেভাবেই আরব সাগর পার করে দেব। অবু জাফর শামসুদ্দিন। মুসলিম সমাজের ঝড়ো পাখি বেনজীর আহম্মদ। পৃষ্ঠা ঃ ২২।

"ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশেই মুসলমানের সংখ্যা বেশী। এরা ছিল গরীব প্রজা বা অতি ক্ষুদ্র ভূস্বামী। জমিদার সাধারণত হতো হিন্দু, গ্রামের বানিয়াও তাই। এই বানিয়াই হচ্ছে টাকা ধার দেবার মহাজন আর গ্রামের মুদি। কাজেই জমিদার এবং বানিয়া প্রজার ঘাড়ে চেপে বসে তার রক্ত শুষে নেবার সুযোগ পেতো। সুযোগের সদ্ব্যবহারও করে নিতে ছাড়তোনা। এই কথাটা মনে রাখা দরকার। কেননা হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ তার মূল রয়েছে এইখানে।" জওহরলাল নেহেরু। বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা- ৯, পৃষ্ঠা- ৩৮১।

হিন্দু জমিদার ও হিন্দু বানিয়া মুসলমান প্রজার ঘাড়ে চেপে বসে তার রক্ত শুষে নিয়ে তাকে রক্তশূন্যই শুধু করেনি, মুসলমানদের 'মানুষ' মনে করতো না, মনে করতো তাদের 'গৃহপালিত পশু'। ভারতীয় ইতিহাসবেত্তা ড. সরকার "দি স্বদেশী মুভমেন অব বেঙ্গল" গ্রন্থে কিশোরগঞ্জের (ময়মনসিংহ) জমিদার শ্রী নিরদ চন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেছেন ঃ

"কৈশোরে কিশোরগঞ্জের দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে নীরদ চন্দ্র চৌধুরী মুসলমানদের প্রতি প্রাক ১৯০৫ সালের হিন্দু ভদ্রলোকদের আচরণের কথা বলতে গিয়ে চার রকম অনুভূতির কথা বলেছেন। প্রথম অনুভূতি ছিল আমাদের উপর এককালে মুসলমানদের রাজত্বের কথা স্মরণ করে অতীতের পুঞ্জিভূত শত্রুতা অনুভব করতাম। আমাদের চতুর্থ অনুভূতি ছিল ঘৃণা ও বিদ্বেষ মিশ্রিত মুসলমান প্রজাদের আমরা 'লাইভস্টক' (গৃহপালিত পশু) মনে করতাম। মূল্যায়নটি রূঢ় শব্দসম্বলিত, তবে মূলত মিথ্যা নয়।" পৃষ্ঠা ঃ ৪১২।

ড. সুমিত সরকারও স্বীকার করেছেন, মুসলমান ছিল 'লাইভস্টক' (গৃহপালিত পশু)। পশুর বাঁচার তাগিদে তেল, নুন, লাকড়ির সমস্যা ভারাক্রান্ত হতে হয় না। প্রসংগক্রমে ভারতী ইতিহাসবেত্তা অধ্যাপক বাসব সরকারের একটি মন্তব্য তুলে ধরা হলো ঃ

"পাকিস্তান আন্দোলন মুসলমান জনসমাজের চিন্তায়-চেতনায় এক যুগান্তর ঘটায়। একজন সাধারণ অমুসলমানের মতো একজন সাধারণ মুসলমান যে বাঁচার তাগিদে তেল, নুন লাকড়ির সমস্যায় ভারাক্রান্ত ছিল পাকিস্তান আন্দোলন তার সামনে এক কল্প যুগের খুলে দেয়...। বাবস সরকার ঃ বাংলাদেশ সামাজিক বিপ্লব ঃ পরিচয় (কলিকাতা) একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৬-৭ পৌষ-মাঘ ১৩৭৮।

শহীদ বুদ্ধিজীবী সিরাজুদ্দিন হোসেন (১৯৭১ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক) "ইতিহাস কথা কও" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"সংগ্রামের সময় যে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, সর্বত্র তার পরিণাম সমান ছিলনা, এমনকি পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি বাংলাদেশের আত্মনিবেদন যতটা আন্তরিক ও

ঐকান্তিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলোর ততটা ছিলনা। সম্ভবত সেই কারণে যে অঞ্চলে শতকরা সাতানব্বই জন মুসলমানের বাস, সে অঞ্চলের মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে শতকরা মাত্র ৫০.৮ ভাগ ভোটের জোরে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ যেখানে শতকরা চুয়ান্ন জন মুসলমানের বাস, সেখানে মানুষ শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিল। এগুলো প্রামাণিক সত্য। সিরাজুদ্দিন হোসেন "ইতিহাস কথা কও" পৃঃ ১৭।

পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান 'লাইভস্টক'-এ স্টিক করতে আর চায়নি তাই পাকিস্তানের পক্ষে ৯৮% জন ভোট দেয়। আমাদের কারণেই পাকিস্তান অর্জন সম্ভব হয়েছিল।

ইচ্ছাকৃতভাবেই আমি এমনসব ব্যক্তিদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিতে চেষ্টা করেছি সাম্প্রদায়িক বলে যাদের অদ্যাবধি কোন দুর্নাম নেই বরং অসাম্প্রদায়িক হিসেবে যাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। অবাক হবার মত বিষয় হলো, উচ্চ বর্ণের উগ্র হিন্দুদের মাত্রাহীন যুলুম ও উস্কানী সত্ত্বেও বাংলার মুসলমানেরা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের সাথে সুদীর্ঘকাল যাবৎ যে মৈত্রী ও সৌহার্দের সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে তার তুলনা জগতের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। ঘরোয়া আলাপচারিতায় আমার এক হিন্দু ছাত্র মাত্র ক'দিন আগে এই কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছিল, "স্যার, আমার মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মুসলমান তারা যারা বাংলাদেশে আছে।" জবাবে আমি তাকে শুধু বলেছি বাংলাদেশের সব মানুষই আসলে ভালো। আমার ঐ ছাত্রটিকে আমি কি করে বুঝাবো যে, আল্লার প্রতি যার খাঁটি বিশ্বাস থাকে ভালো হতেই হয়- তার আবাস পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন।

বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িকতার দাবীদারগণ প্রকৃতই কতটা অসাম্প্রদায়িক

বাংলাদেশে যারা সাম্প্রদায়িকতার দিবাস্বপ্ন দেখেন এবং ঘন ঘন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন তারা নিজেদের কিন্তু অসাম্প্রদায়িক প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। একজন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন ধর্মকে বা ধর্ম পালনকারী কোন গোষ্ঠিকে নিজে তো গালি দেবেনই না উপরন্তু কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে কেউ গালি দিলে তারা অবশ্যই তার নিন্দা জানাবেন। কিন্তু বাংলাদেশে তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ তাদের কথা ও কাজের কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেয়ার কাজটিই করেছেন।

ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে বসনিয়ায়। একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করতে গোটা জনপদকে কফিনে পরিণত করতে চেয়েছিলো ঈঙ্গো মার্কিন অক্ষশক্তি। তাই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এবং ঠাণ্ডা মাথায় ইতিহাসের এই

নিষ্ঠুরতম গণহত্যা চালানো হয়। সেদিন বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কোন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে আমরা দেখিনি। শাতিলা সাবরার মত অসংখ্য পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের যখন ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যের পুষ্যপুত্র সন্ত্রাসী ইসরাইল পাখির মত গুলি করে মেরেছে কিংবা ইসরাইলী বহিষ্কারের ফলে মরুভূমির খোলা আকাশের নিচে শত শত স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনী মানবেতর জীবন যাপন করেছে তখনও তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়টিকে আমরা বিচলিত হতে দেখিনি। ভারতে গত পঞ্চাশ বছরে গড়ে প্রতিদিন একটির বেশী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে, অথচ সাম্প্রদায়িক হবার ভয়ে আমাদের নিরপেক্ষ (?) বুদ্ধিজীবীরা এর প্রতিবাদ করে কোন প্রবন্ধ লিখেনি। আসাম কাশ্মীরের মসুলিম নারীদের জীবন ও সম্ভ্রম ভারতীয় নষ্ট হয়েছে কিন্তু এদেশের তথাকথিত নারীবাদীরা তার বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ তোলেনি। বর্মীদের মুসলিম হত্যাযজ্ঞে লাল হয়ে গেছে নাফ নদীর পানি, লক্ষ লক্ষ রোহিংগা মুসলমান প্রাণভয়ে ছুটে এসেছে বাংলাদেশে। কিন্তু স্বঘোষিত অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি সমাজসেবকগণ না এই জঘন্য বর্বরতার প্রতিবাদ করেছে না তারা কখনো এগিয়ে এসেছে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর জীবন রক্ষায়। সত্যি কথা হচ্ছে মুসলমান নাম বহনকারী এইসব ইসলামী বিদ্বেষী মুসলমানের বিপর্যয়ের খবর শুনলে পুলকিত হয়, মুসলমানের লাশের গন্ধ পেলে উল্লাসিত হয়- স্বজাতির দুঃখে আনন্দিত হবার মত এমন পৈচাশিকতা জগতের কোন প্রান্তে আছে বলে আমার জানা নেই।

এই যে, ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার মত একটি কলঙ্কিত ঘটনার জন্ম হলো ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে কেউ কি দেখেছেন আমাদের এদেশী নিরপেক্ষবাদীদের টু শব্দটি করতে হয়? আইন করে দিল্লীসহ ভারতের বিভিন্ন শহরে মুসলমানদের গরু জবাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোন শহরের শুকরের রক্ত প্রবাহিত হলে গরুর রক্ত প্রবাহিত হতে আপত্তি কোথায়? এইতো মাত্র কিছুদিন আগে কোলকাতায় মাইকে আজান নিষিদ্ধ করা হলো। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এর একটুও নিন্দা করলোনা। উপরন্তু কোলকাতার অনুকরণে বাংলাদেশে আজান বন্ধের স্বপ্ন দেখছে কেউ কেউ। আওয়ামী বুদ্ধিজীবী ড. মাযহারুল ইসলাম যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি ছিলেন তখন সেখানকার কেন্দ্রীয় মসজিদের মাইকের ভিসি'র বাসভবনমুখী হর্ণটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন কারণ ভোরবেলায় আজানের শব্দে নাকি তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতো। একদা পাকিস্তানের নির্ভেজাল দালাল যিনি ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের পটভূমিতে লিখেছিলেন ঃ

"এর জন্য সব প্রশংসা পরম করুণাময় আল্লাহর, যার অপার অনুগ্রহেই আমাদের সত্য ও ন্যায়ের যুদ্ধ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে... হিন্দুস্তানের মত জঘন্য প্রতিবেশী কল্পনা করাও

দুষ্কর।" (কবির চৌধুরী যুদ্ধ ও আমাদের কর্তব্য: মুনির চৌধুরী সম্পাদিত সংগ্রাম ও সংহতি; পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃঃ ২০৭)

বাংলাদেশ আমলে তিনিই লিখলেন: "আজান বড় বিরক্তিকর"। আজান বিষয়ে একই ধরনের বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন বাংলার বিবেক বলে খ্যাত আবুল ফজল সাহেব তার বহু বিতর্কিত 'মানবতন্ত্র' বইটিতে। ইসলাম বিদ্বেষে এপার ওপারে কি অদ্ভুত মিল।

শেষ কথা

মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আসলে ইসলাম বিদ্বেষীদের আবিষ্কৃত তিনটি মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র যার অভিন্ন লক্ষ্য ইসলামের অনিবার্য বিপ্লবকে বিলম্বিত করা। মুসলমানদের সীসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্য এবং শপথের ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা এই মারণাস্ত্রের হাত থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষা করতে পারে। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সেরা আমল, দক্ষ নেতৃত্ব, নিরন্তর সাধনা আর আত্মত্যাগের কোন বিকল্প নেই। সর্বোপরি, আল্লাহর সাহায্যই হচ্ছে মুমিনের সকল সাফল্যের মূল নিয়ামক। আমরা অবশ্যই পারবো আগামীর ইসলামী বিপ্লবকে অনিবার্য করে তুলতে।